সংবাদ প্রতিদিন ২০এপ্রিল ২০০৮

রোববার

ব্লগ

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

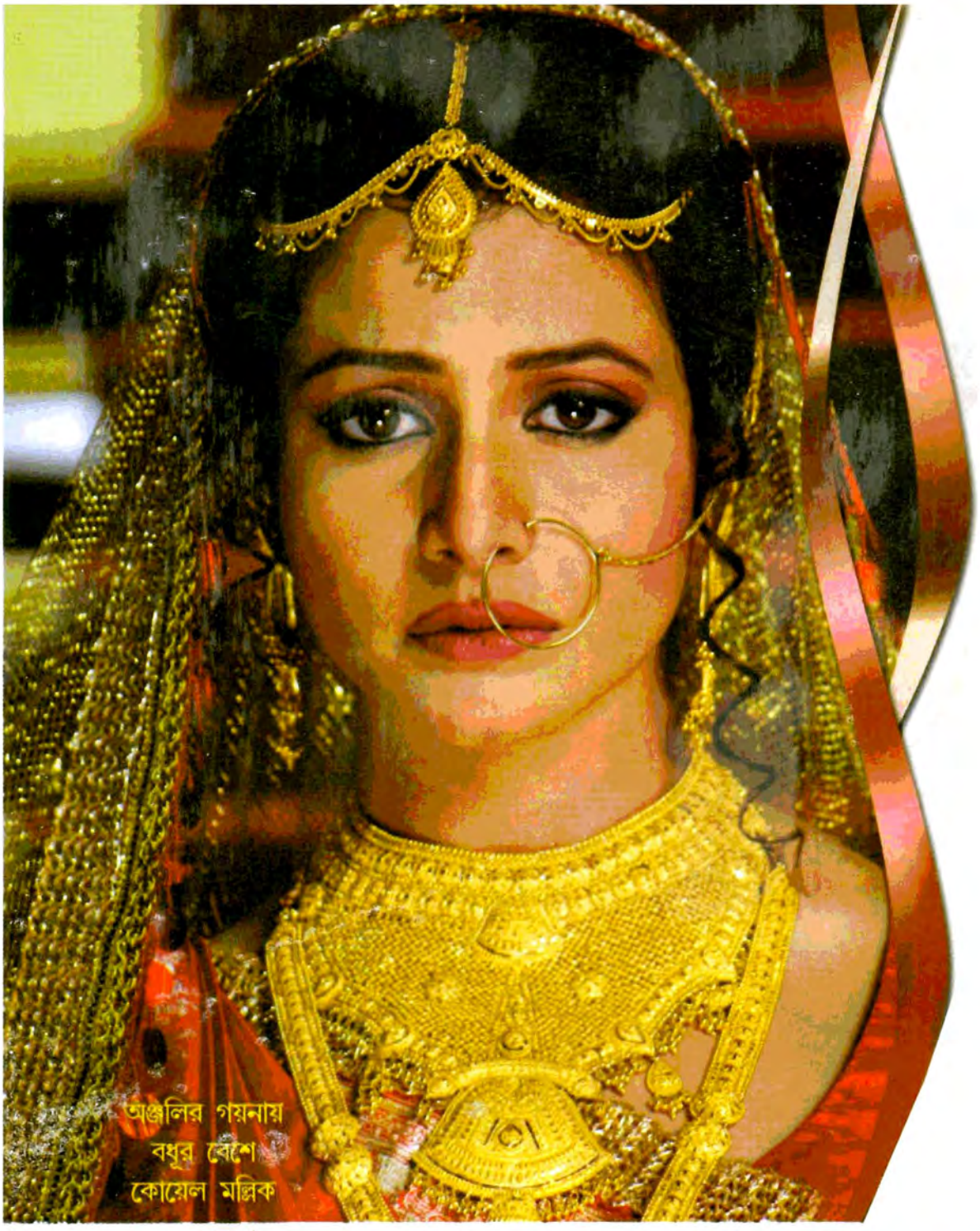

প্রেমের কাহিনী

পরিচালনা রবি কিনাগী
সঙ্গীত জিৎ গাঙ্গুলী

শ্রীকান্ত মোহতা নিবেদিত
শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস্ প্রযোজিত

অঞ্জলি জুয়েলার্স™
সবার জন্য

গোলপার্ক	সল্টলেক	বেহালা	শোভাবাজার
২৪৪০ ১৭৯২ / ২৪৬০ ০৫৮১	বি ই -১০১, ২৩২১ ২০৫৭ / ২৭৮৬ এইচ এ - ৩, ২৩২১ ৮৩১০ / ৮৩১১	২৪৪৫ ৫৭৮৪ / ৫৭৮৫	২৫৩৩ ৫৮৩২ / ৫৮৩৪

www.anjali.biz

theadventurekol@gmail.com

লেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৪
ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬
ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৮
এবার মলাট
ব্লগ
ব্লগবাজি
রঞ্জন সেন ১০
ব্লগ ইন ব্লগ আউট
অনুব্রত চক্রবর্তী ১৬
গোঁসাইবাগান
জয় গোস্বামী ২২
বাংলার মুখ
পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ২৬
রোববারের রামপ্রসাদী
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২৮
রোববারের মেগা
কলিকাতায় নবকুমার
সমরেশ মজুমদার ৩৪
সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৮
রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
আফরার মিটবল
ইন বারবিকিউ সস ৪০

টিম রোববার

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
গীতিযা দাশগুপ্ত
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

লে
লেটারবক্স

রাতের চেয়েও অন্ধকার

২৫ নভেম্বর রোববার-এর বিস্মিত বিষয় 'অদ্ভুত আঁধার এক' যে অন্ধকারময় সময়ের সম্পর্কে সচেতন করল, তা শুধু আশ্চর্যের নয়, ভয়ংকরও বটে। যুগে যুগে পৃথিবীতে অন্যায় বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠকে শাসকের রক্তচক্ষু দেখিয়ে অবরুদ্ধ করার ঘটনার অভাব নেই। কিন্তু আমাদের একান্ত নিজেদের রাজ্যে নন্দীগ্রামের নৃশংসতা যেন নয়া ইতিহাস রচনা করেছে! গায়ের রক্ত হিম করা এমন হিংস্রতা সত্যিই খুব কম দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ নরনারীর ওপর এমন সন্ত্রাস তথা অমানবিক অত্যাচার বেনজির। স্বাভাবিকভাবেই আমরা নিরন্তর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। কানে শুধু শুনতে পাচ্ছি, বন্দুকের বেপরোয়া গুলির অবিশ্রান্ত শব্দ। কবে যে কে কার দ্বারা আক্রান্ত হবে কেউ তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। তাই তো প্রতি পদক্ষেপে এত সন্দেহ এত অবিশ্বাস। এতে অস্বাভাবিক কিছু ভাবার জায়গা নেই। আসলে অন্ধকার সবসময় রহস্যময় হয় জানি। কারণ সেটাই তার সত্যিকারের চরিত্র। কিন্তু আজকে যে আঁধার এসেছে তার শরীরে শুধু সীমাহীন আতঙ্ক আর আশঙ্কা! তাই তো অবাক না হয়ে পারা যাচ্ছে না! রাতের শেষে আলোর উৎস সন্ধানের দায়িত্ব নেবে কোন সুস্থ সকাল?

দেবাশিস হাজরা
হাওড়া

প্রতিবাদী মানুষ

খুবই সময়োপযোগী উপস্থাপনা রোববার-এর 'অদ্ভুত আঁধার এক' সংখ্যা। সিঙ্গুরের পর নন্দীগ্রামের সন্ত্রাস, রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শিল্পের প্রয়োজন অস্বীকার করবে এমন অবুঝের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু সে সৃষ্টি সুখের উল্লাস কি সভ্যতা বিলুপ্তির বিনিময়ে পেতে হবে? এ তো যুধিষ্ঠিরের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়! সাড়ে চুয়াত্তর মন উপবীত আখ্যানের পুনরাবৃত্তি যেন। নবনীতাদির যুক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু 'ব্যক্তি' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কি তাহলে 'গুগাবাবা' চলচ্চিত্রের সেই মন্ত্রীর চক্রান্তে ওষুধে বশীভূত অসহায় রাজার মতো, না বুঝেই আপন ভায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রণী? তাহলে কি সেই অশুভ শক্তি স্বচ্ছ বুদ্ধদেববাবুর প্রতিমূর্তিকে কালিমা লিপ্ত করায় প্রয়াসী? তারাই তো সন্ত্রাসের মুখ! তাদের চিহ্নিত না করে যেভাবেই সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা করা হোক না কেন তা বিফল হবেই। মায়ারহোল্ড হত্যার মতো সন্ত্রাস এ পৃথিবীর বুকে যুগে যুগে চলে আসছে। এ এক গভীর অসুখ এখন। সন্ত্রাসের প্রকৃত লক্ষ্য পূর্ব উপলব্ধ প্রায়শই হয় না, তাই এর প্রতিরোধও এক দুরূহ ব্যাপার। লখিন্দরের বাসরের কোনও এক ছিদ্রের মতো শাসনযন্ত্রের অলক্ষিত আইনি শৈথিল্যের মধ্য দিয়ে এ ব্যাধির প্রবেশ। প্রতিকারে প্রতিবাদ আর কতদিন? প্রতিবাদ করার মানুষ শেষ পর্যন্ত থাকবে তো? কথায় আছে নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? রেহাই যখন পাবই না তখন শক্ত হাতে হাল ধরে দেখিই না একবার। দেখাই যাক না সেই মাটির প্রদীপের মতো যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা দিয়ে 'তিমির বিনাশী' হতে পারি কি না!

সুভাষ মুখার্জি
নদিয়া

সত্য-অসত্যের লড়াই

'অদ্ভুত আঁধার এক' সংখ্যাটিতে পাঠকসমাজের কাছে এক আঁধার রাজ্যের সন্ত্রস্ত আবহাওয়ার কাহিনি কাব্যভাবনায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। ধন্যবাদ রোববার-এর টিমকে। নাট্যকার সুমন মুখোপাধ্যায় এক সহজ সত্যকে তুলে ধরেছেন 'সত্য-ই হল রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।' হ্যাঁ, আজ এই সত্য-অসত্যের লড়াই-এ আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব বড়ই পরিলক্ষিত। সত্যের পক্ষে দাঁড়ালেই মাঝখানে চলে আসছে বিভাজনরেখা। অসত্যের ঘরে জন্ম নিচ্ছে সন্দেহ এবং তা থেকে শত্রুভাবনা। সত্য-অসত্যের লড়াই-এ সমাজ আজ বিপন্ন। দেশের শিক্ষিত সমাজও যখন এই লড়াই-এ বিভাজিত হয়ে পড়েন তখন রাষ্ট্র দ্বারা এক অদ্ভুত আঁধার জন্ম নেয়। যাঁরা সেই আঁধার থেকে সত্যকে সামনে তুলে এনে আলো জ্বালাবার চেষ্টা করেন তাঁরা রাষ্ট্রের কাছে শত্রু হয়ে পড়েন। আমরা এখন সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি। এ এক চরম দুঃসময়। আমাদের প্রতীক্ষা, দুঃসময় কাটানোর।

কমল মজুমদার
কলকাতা-৫৭

নিবন্ধ পাঠে অতৃপ্তি

২৫ নভেম্বর 'অদ্ভুত আঁধার এক' সংখ্যার 'আত্মবৈরিতা' শীর্ষক নিবন্ধে নবনীতা দেবসেন লিখেছেন, 'আমাদের প্রজন্মের অনেকেই আছি যারা কোনও তৃণমূলে কি তরুমূলে বসে নেই, লাল কমলা হলুদ সবুজ কোনও দলেই নাম লেখাইনি, **কিন্তু** নীতিগত অবস্থানে চিরকেলে এক নাগাড়ে বামপন্থী পাবলিক' এখানে বামপন্থী বলতে লেখিকা সিপিএম-কেই বুঝিয়েছেন। এসইউসিআই, মাওবাদী বা অন্য কোনও নকশাল দলকে যে নয়, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শ্রীমতী দেবসেন এর আগেও (১৪ মার্চের পর) যখনই শাসকদলের নিন্দা করেছেন, তখনই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও বিরোধী দলের কাছাকাছি যেতেও ইচ্ছুক নন। কিন্তু বিরোধী দলের থেকেও সমদূরত্ব প্রমাণ করার তাঁর যে এই প্রয়াস তা কীসের ইঙ্গিত? পরিস্থিতি থিতু হলেই ঝাঁকের কই ঝাঁকেই মিশে যাওয়ার ইঙ্গিত নয় কি? অবশ্য কই কি সত্যিই ঝাঁক থেকে বেরিয়েছে? নাহলে ১০ নভেম্বরের গণহত্যার পরেও তিনি কী করে বলেন, 'আমি সরকারের বিপক্ষে নই...'? তাই তাঁর নিবন্ধ পাঠে তৃপ্তি পেলাম না। মনে হল, তিনি নয়, বোধহয়

ক্ষিতি গোস্বামী লিখছেন!

প্রশান্ত গুপ্ত
কলকাতা-২৯

উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম

২৫ নভেম্বর রোববার-এ ঋতুবাবু তাঁর কলাম 'ফার্স্ট পার্সন'-এ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের অভিমত ও অভিজ্ঞতার কথা লেখ্য ভাষায় জানতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে একটি পৃথক বিভাগও থাকবে জেনে আশ্বস্ত হলাম। কারণ আজ আমরা আর সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারপ্রাপ্ত স্বাধীন নাগরিক নই।

প্রায়ই টিভিতে নয়তো খবরের কাগজে দেখি পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামী জনতার খণ্ডযুদ্ধের খণ্ডচিত্র। লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া, ইটপাথর ছোড়াছুড়ি, রক্তাক্ত, বিভৎস মানবশরীর। এইসব দেখেশুনে মনে বড় ভয় জাগে, এ কোন ভারতবর্ষে আমরা বাস করছি? এই দেশটায় আমরা স্বাধীন নাগরিক, নাকি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের করাল ছায়ার তলে বসবাস করা পরাধীন রাষ্ট্রীয় ক্রীতদাস?

আজকে কি মনে হয় জানেন? একজন রাজা যদি গোটা দেশটার শাসক হত, তাহলে তার হাতে সন্ত্রাসজনিত পীড়নের ভয়টা একজনকে ঘিরেই থাকত। কিন্তু এতসব মন্ত্রী, আমলা, রাজনৈতিক নেতার যেখানে ছড়াছড়ি, সেখানে রাষ্ট্রের হাতে মার খাওয়ার ভয়টাও যেন নানামুখী।

তাই সবশেষে বলি, এই স্বাধীনতার নামে চরম ভাঁওতাবাজির দেশে, ঋতুবাবু আর কিছু পারুন বা নাই পারুন, সবার মন যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অকস্মাৎ বলি হওয়ার ভয় ও আশঙ্কায় বিহ্বল—তা প্রকাশের জন্য রোববার-এ যে একটা চমৎকার প্ল্যাটফর্ম করে দিচ্ছেন, এরজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরি
উত্তর চব্বিশ পরগনা

চেয়ার দখলের লড়াই

ঋতুদা, ২৫ নভেম্বর রোববার-এ 'অদ্ভুত আঁধার এক' সংখ্যায় আপনার 'ফার্স্ট পার্সন' অন্তত পাঁচবার পড়লাম। আপনি লিখেছেন, 'আপনারা সবাই চাইলে, এই বিষয়টা রোববার-এর একটা নিয়মিত বিভাগ হতে পারে।' অর্থাৎ এই বিষয়টা মানে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস'। আমি আপনার ইচ্ছেকে সমর্থন জানাচ্ছি। জানাচ্ছি এইজন্যই যে, এ ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একজোট না হলে, হয়তো একদিন সমগ্র পৃথিবীটাকেই এঁরাই ধ্বংস করবে। কারণ এঁদের কোনও মানবিকতা বোধ নেই, বিবেক নেই, বিবেকের দংশন নেই। আছে—আত্মবৈরিতা, ঔদ্ধত্য, বন্দুকের নল আর ভোট-যুদ্ধে যেভাবেই হোক চেয়ার দখলের লড়াই। কিন্তু চেয়ার দখল করলেই যে, কিছু দায়িত্ব বর্তায়, সেই সামান্য জ্ঞানটুকুও নেই। অসামান্য প্রতিভা এঁদের। শিল্পকলায় যত না মন, তার সিকিরও সিকি ভাগ মন কৃষিকাজে নেই। অথচ তাঁদের স্লোগান—'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যত'! একটাই অনুরোধ, কৃষকের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন না।

বুদ্ধু ভট্টাচার্য
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
ই-মেল :
robbar.pratidin@gmail.com
ফ্যাক্স : 22127977

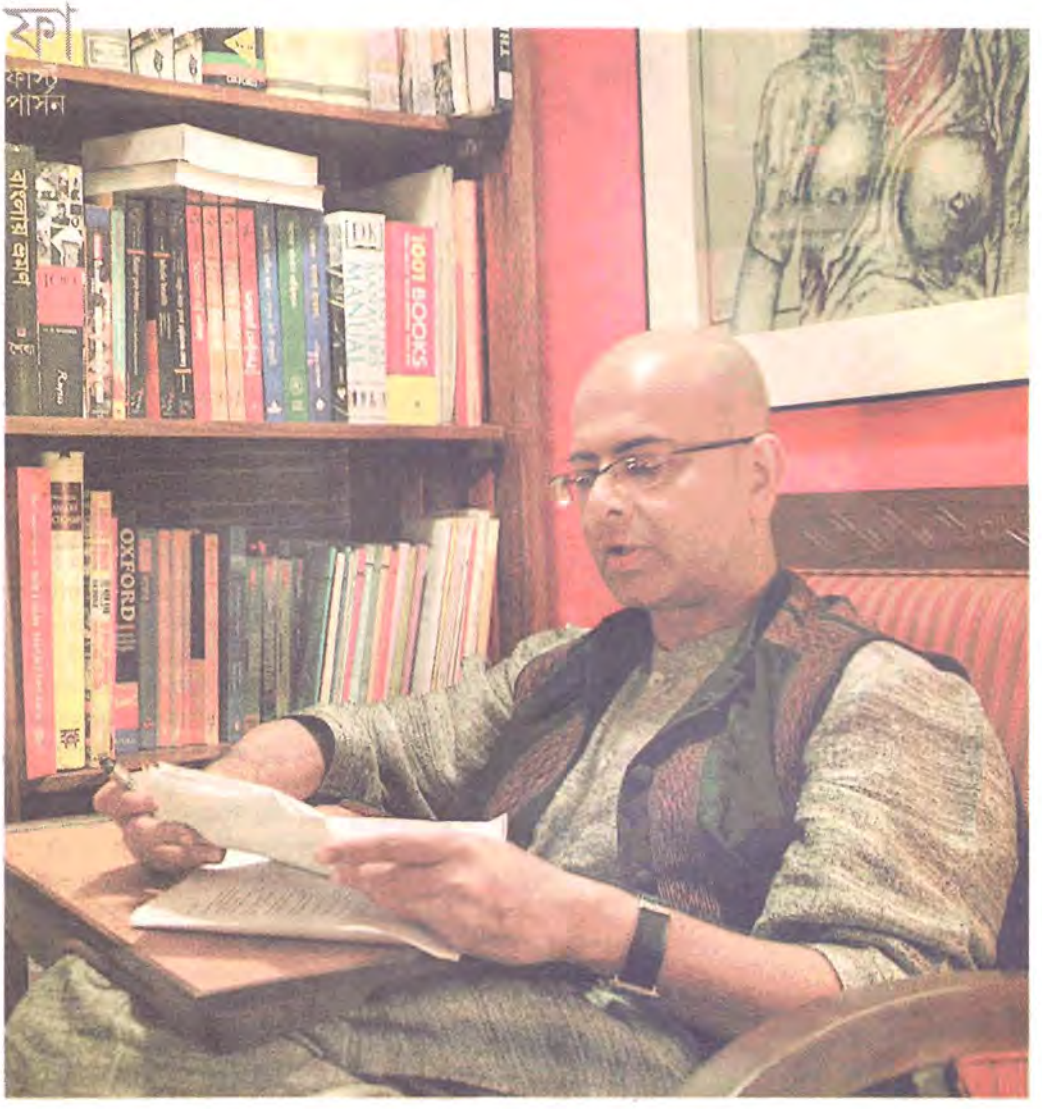

হঠাৎ দপ্তরে কয়েকটি ক্রুদ্ধ চিঠি এসে পৌঁছেছে। আমি আমার একটি সাম্প্রতিক 'ফাস্ট পার্সন'-এ 'বার খেয়ে ক্ষুদিরাম' কথাটা কেন ব্যবহার করেছি, তাতে উষ্মা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন পাঠক।

তাঁদের মত—এতে ক্ষুদিরাম বসু'র মতো প্রাতঃস্মরণীয় একজন স্বদেশপ্রেমীকে অপমান করা হয়েছে।

হয়তো একটা কপট ক্ষমা চেয়ে নিলে ব্যাপারটা মৃদু ও মার্জনাযোগ্য হয়ে যেত।

আমি ইচ্ছে করেই তার মধ্যে যাচ্ছি না।

আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বনির্বাচিত বাচনভঙ্গি যদি আমার পাঠকদের অপছন্দের, অননুমোদনের হয়ে থাকে; তাহলে তাঁদের সঙ্গে আমার অন্তত সরাসরি কথা বলার একটা জায়গা তৈরি হওয়া উচিত।

পূর্বেও 'রোববার' দপ্তরে আপত্তিসূচক মন্তব্য এসে পৌঁছয়নি, তা নয়।

'রোববার' অত্যন্ত গণতান্ত্রিক সম্মানের সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেছে যে কোনও রুষ্ট সমালোচনাকে 'লেটার বক্স'-এর অন্তর্গত করতে। সমালোচনাও যে আমাদের কাছে অত্যন্ত স্বাগত, তার আদর যে নিছক প্রশংসার থেকে কোনও অংশে কম নয়—এ কথা 'রোববার'-এ আমরা সবাই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

মনে পড়ছে বনলতা সেন সংখ্যায় যখন চিত্রশিল্পীর দেখা নগ্নিকা অবয়ব ছাপা হয়েছিল, কয়েকজন পাঠক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

রোববার দপ্তরে বেশ কয়েকটি আক্রমণাত্মক চিঠি এসেছিল। 'রোববার' চিঠিগুলোকে সযত্নে প্রকাশ করেছিল মাত্র। কোনও প্রত্যুত্তর দেয়নি।

এই নীরবতা অগ্রাহ্য করার অহঙ্কার নয়। বিপরীত অভিমতকে সম্ভ্রমে গ্রহণ করার নম্রতা।

রোববার-এর এই নিজস্ব সৌজন্য হয়তো বা ভুল সংকেত পাঠিয়েছে কয়েকজন পাঠকের মনে। হয়তো বা তাঁরা ভেবেছেন—তাঁদের এই সমালোচনাগুলো এতই সঠিক ও অভ্রান্ত যে, রোববার স্বাভাবিক্ নিরুপায় মৌনতায় তার নিজস্ব অনবধানের ভ্রান্তি বা স্বেচ্ছাকৃত রুচিহীন অশ্লীল চর্চাকে অনুতপ্তচিত্তে স্বীকার করে নিচ্ছে।

সঙ্গোপনের ভাষা যখন সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না, তখন কোথাও বোধহয় সম্পাদককে একটা দায়িত্ব নিতে হয়। মুখর হওয়ার।

'বার খেয়ে ক্ষুদিরাম' বাক্যাংশটি প্রয়োগ করার সময় আমি ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হইনি যে, ক্ষুদিরাম বসু একজন শ্রদ্ধেয় অগ্রজ দেশপ্রেমী।

আদরের জনকে নিয়েই নির্মল ঠাট্টা করা যায়, আপনার জনকেই 'ডাকনাম' দিতে পারে মানুষ। আজ যদি ভালবেসে কাউকে 'দূর পাগল!...' বলি, আর তাবৎ পাঠক হা হা করে ওঠেন—যে এতে করে দুনিয়ার সমস্ত মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে অপমান করা হল, সে তাঁদের দুর্ভাগ্য।

আমরা রবীন্দ্রনাথকে আদর করে 'দাড়িবুড়ো' বলি, ঋত্বিক ঘটক প্রায় প্রকাশ্যে সত্যজিৎকে 'ঢ্যাঙা' বলে ডাকতেন। আমরা যখন উৎকর্ষের অসাম্য বোঝাতে গিয়ে অত্যন্ত অবলীলায় বলি—'কোথায় নেতাজি, আর কোথায় পিঁয়াজি'—তখন আমরা যেমন সুভাষচন্দ্র বসু নামক এক বীর বঙ্গসন্তানকে বিদ্রূপ করি না, তেমন পিঁয়াজি নামক তৈলাক্ত সুস্বাদু বৈকালিক আহার্যটিকেও ব্রাত্য বলে গণ্য করি না।

এটা বাগধারা। পাতি কথায়, 'কথার লব্জ।'

পাতি শব্দটি ইচ্ছে করে ব্যবহার করলাম—যাঁর চিঠি লিখতে হয় লিখবেন, আমরা ছাপব। কিন্তু বিনীতভাবে এটাও জানিয়ে দেব যে বাংলাভাষা কেবলমাত্র তৎসম শব্দের সমাহার নয়। সেখানে 'ঘ্যাম' (উৎকৃষ্ট) এবং 'পাতি' (commonplace)—সব বাকভঙ্গিরই সমান সম্মান আছে।

আমরা অধিকাংশ সময়ই কোনও একটা নামের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের দ্যোতনা খুঁজে না পেলে সে নামকে যথেষ্ট কুলীন মনে করি না। ফলে 'লাল্টু' বা 'পল্টু' নাম তেমনভাবে কারুর বৈধ সামাজিক পরিচয় হিসেবে মেনে নিতে পারি না, যেমন হয়তো বা পারি 'ঋতুপর্ণ' বা 'অনিন্দ্য' ইত্যাদি নামগুলিকে। কিছু অপ-প্রচলিত বাক্যাংশকে অসম্মানজনক মনে করাও যেন তেমনই এক উন্নাসিক কৌলীন্যবাতিক।

বাংলাভাষা তার নিজস্ব বেগবতী প্রবাহের মধ্যে বহু শব্দ, বাক্য, উপমাকে সংগ্রহ করে এসেছে নিরন্তর।

সেই সব নিত্যপ্রয়োজন যদি বাঙালির জিহ্বাকে অতিক্রম করে লেখনীতে নেমে আসার সুযোগ না পায় কোনওদিন, তাহলে বাংলাভাষাকে তার বিশুদ্ধ, অসার সাংস্কৃতিক অচলায়তনের জাড্য থেকে মুক্ত করে কার সাধ্য!

মনে আছে প্রসেনজিৎকে নিয়ে লেখা আমার কোনও একটা ফার্স্ট পার্সনে আমি একবার উল্লেখ করেছিলাম যে বুম্বা আমাকে 'খিস্তি' সহকারে প্রীতি সম্ভাষণ করে।

একজন পাঠক চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যদি তাঁর পুত্রসন্তান তাঁকে খিস্তি সহকারে পিতৃসম্বোধন করে, উনি সেটা আটকাবেন কী করে?

আমরা চিঠিটা ছেপেছিলাম মাত্র। কিছু বলিনি। আজ বলছি যে, আমার একটি সপ্তাহান্তের বাক্যাংশের দৃষ্টান্তক্ষমতা যদি তাঁর এত বছরের সন্তানশিক্ষার থেকেও বেশি শক্তিশালী হয়, তবে এই অপারগতার দায়টা তাঁর—'রোববার'-এর নয়।

আমরা, 'রোববার'-এর কর্মীরা 'রোববার'কে শিল্পসম্মত এবং রুচিকরভাবে পরিবেশন করতে চাই। অবশ্যই আমাদের নিজস্ব রুচি ও বোধ অনুসারে।

'শিল্পসম্মত' কথাটি আলাদা করে ব্যবহার করছি এই জন্য যে, শিল্পীর সামাজিক হওয়ার দায় হয়তো বা কিছু থাকে, কিন্তু politically correct হওয়ার কোনও দায় তার নেই।

যাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন বাক্যবন্ধে 'পাতি', 'খিস্তি', 'বার খেয়ে...' প্রতিনিয়ত ব্যবহার করেন, তাঁরাও নিঃসন্দেহে আমাদের আর পাঁচজন শীলিত, মার্জিত, সুভদ্র, মানুষের মতোই সমান সামাজিক।

'আমরা' 'ওরা' করে কী হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে, তা তো স্বচক্ষে দেখলাম সকলে।

মনে মনে হয়তো আশা করেছিলাম—বিগত বঙ্গাব্দের সমস্ত গ্লানি এবং লজ্জার সঙ্গে এই কৌলীন্যের উন্নাসিকতাও আমরা ত্যাগ করতে পারব এই নতুন বছরে। একসঙ্গে সবাই মিলে নিশ্বাস নেব এক উন্মুক্ত পৃথিবীতে।

আমরা যেন ভুলে না যাই, কেবল নন্দীগ্রামের সুখ-দুঃখকে অপাংক্তেয় করে দেওয়াটাই ঔদ্ধত্য নয়। নিত্যদিনের পথেঘাটের বহমান সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যেও একধরনের উচ্চবর্ণজাত ফ্যাসিজিম আছে।

নতুন বছরের প্রথম রোববারে সে কথা একবার সবাই মিলে ভেবে দেখি না কেন!

দেখবেন আপনার ১৪১৫ কেমন সুন্দর, সুসমঞ্জস হয়।

থুড়ি, 'ফাটাফাটি' হয়!

শুভ নববর্ষ।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

ভালো-বাসার
বারান্দা

নবনীতা দেবসেন

অথ সন্ত কথা

আমি খুব সৌভাগ্যবতী, প্রায়ই দেখি আমি অদ্বিতীয়, অভূতপূর্ব মানুষদের সঙ্গে সময় কাটাই। আরও গৌরবের বিষয়, এরা সকলেই বঙ্গসন্তান। কলকাতা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বহরমপুর, বাঁকুড়া, নদীয়া—যেখানে যাই সর্বত্র এঁদের দেখা পাই। স্ত্রী এবং পুরুষ দু'জাতিতেই এঁরা আছেন। প্রত্যেকেই তাঁরা নিজেরা কে কীরকম সেটা উপস্থিত শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত এবং দক্ষ। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা অনায়াসে অনবরতই আপনাকে জানাবেন তাঁরা কীরকম, এবং তাঁরা কীরকম নন। আপনাকে আলাদা কষ্ট করতে দেন না তাঁদের চরিত্র বুঝে নেওয়ার জন্য। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি। 'আত্মানং বিদ্ধি' এই মহামন্ত্র তাদের জন্যই উচ্চারিত হয়েছিল। তাঁরা আত্মাকে জেনেছেন, এবং জানাচ্ছেন। আশ্চর্য হয়ে মাঝে মাঝে ভাবি এতগুলি সন্ত স্বভাবের স্ত্রী ও পুরুষ আমার সামান্য এই জীবনে দর্শন দিয়েছেন, কে বলেছে এটাকে কলিকাল?

কেউ কেউ ঠিক সন্ত নন, তারা প্রকৃত শিল্পী। এই তুচ্ছ জগৎসংসারে বিষয়গতভাবে তাঁদের কোনও আগ্রহ নেই। তাদের ভাললাগার পরিধি অনেক বিস্তৃত, তারা নেতি, নেতি, করে এগিয়ে চলেন, হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনওখানে, তাদের তৃপ্তির হদিশ নেই কোনও, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না।' তাদের খুশি রাখতে পারেন এমন ম্যাজিশিয়ান মরজগতে নেই। তারাও সাধারণত আমাদের ধন্দে না ফেলে রেখে পষ্টাপষ্টি বলেন, 'আমি এই রকম'। মানুষ চিনতে কত সুবিধে হয়ে যায় বলুন তো মুখে খোলাখুলি এই সব ব্যাপারগুলো একটু জানিয়ে দিলে।

'আমি অদ্বিতীয় আমি অনন্য আমি অভূতপূর্ব আমি তুলনাহীন আমি সর্বশ্রেষ্ঠ আমি সর্বজনপূজ্য আমি সেলিব্রিটি' এই মন্ত্র জপ করতে করতে তারা মরা মরা করে রামনাম উচ্চারণের মতো একদিন সত্যি সত্যি সেলিব্রিটি হয়ে যান। আমরা, সর্বসাধারণ, তাদের আত্মপ্রচারে মুগ্ধ হই, তাদেরই মুখে তাদের গুণপনা জেনে বিশ্বাস করি, তাদের ভয় ভক্তি করি, তাদের মতো হতে চেষ্টা করি। তারা ভক্তপরিবৃত হয়ে ভাবেন, আমি ওদের মতো নই, আমি ওইরকম নই, আমি এইরকম, আমি যা বলি আমি আসলে সেইরকমই। আমি সর্বজন শ্রদ্ধেয়, আমি স্বর্গজনশ্রদ্ধেয়ও। কেন নই? আমার মতো আগেও ছিল না, পরেও হবে না। আমি চিরকালই এইরকম ছিলুম চিরদিন এইরকমই থাকব। একে বলে অটো সাজেশন, কিন্তু একে তপস্যাও বলা যেতে পারে। এক কথা বার বার বলতে বলতে চোরডাকাত যদি সাধুপুরুষ হয়ে যায় তাহলে আমিই বা কেন এক কথা বার বার নিজেকে বোঝাতে বোঝাতে কেউকেটা বনে যাব না? এ সেই শিব্রাম চক্রবর্তীর 'দেবতার জন্ম' গল্পটার মতোই, সেলিব্রিটির জন্ম বৃত্তান্ত।

সেই ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে 'সে ভালোবাসে/সে ভালোবাসে না' জপ করার মতো তারা নিজেদের এবং আমাদের কানে কানে অনবরত বলে যান, 'আমি ওইরকম নই, আমি এরকম, আমি ওইটি নই, আমি এইটি। আমি সদাসত্যকথা বলি, আমি কারুর মনে কষ্ট দিইনা, দিতে পারি না, বড় মায়াদয়ার শরীর আমার, অন্যের কষ্ট আমি দেখতে পারি না, শুনতেও পারি না, অসুস্থ বোধ করি, আপনা থেকে তাই সর্বদা সাধ্যমতো অপরের উপকার করি। বিনা স্বার্থে কেউ তো কারুর উপকার করে না আজকাল, কিন্তু আমি খুব আলাদা তো, তাই আমি নিঃস্বার্থভাবেই লোকের উপকার করে থাকি, এজন্য সবাই আমাকে খুব ভালবাসে, আমার মাকে তো সবাই বলে রত্নগর্ভা! আমি বাবা সাদাসিদে মানুষ, কোনও ঘোরপ্যাঁচ পাবে না, যা ভাবি সব সোজাসুজি বলে দিই আমি কিন্তু কারুর মন রাখি না সে তুমি যত বড় মানুষই হও না। আমার কাছে সবাই সমান, কুলিটা রিকশাওলাটাও যা মন্ত্রী এমপিও তাই। আমি তো কারুর কাছে কিছু চাই না, নির্বিবাদী নিরহংকারী মানুষ, আপনমনে থাকতে ভালবাসি, কখনও নিজেকে সামনে দিকে ঠেলি না, নিজের কথা নিজের মুখে বলতেই পারি না তাই তো আমার জীবনে কিছু হল না, এই যুগটা হয়েছে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর যুগ। স্বভাবতই বিনয়ী কিনা, তাই ওইটি আমার দ্বারা হবে না! তাতে জীবনে কিছু হোক ছাই না হোক ছোটবেলা থেকেই আমি বড় সরল তো, তাই মা আমাকে বকতেন, আমি যে সকলকে বিশ্বাস করে ফেলি, ঠকিনি তাও নয়, তবুও করি। না করে পারি না, আমি ওইরকমই যে! আমাকেও অবশ্য সবাই বিশ্বাস করে, আমুকের সিন্দুকের চাবি আমার কাছে থাকে তমুকের ব্যাঙ্কের বইপত্তর আমার ড্রয়ারে রেখে দেয়, আমি সত্যি বলতে কী, এইরকমই, আমি বড় সেইরকম, আমি না, একদম ওইরকম নই, আমি না, একেবারে ওইরকম হতে পারি না, হতে চাইও না, আমি আসলে এইরকম, মানে যেইরকম মানুষ কেউ কখনও দেখেনি দেখবেও না, কেননা ভূ-ভারতে একবারই জন্মেছে, আমি সেইরকম। যেরকম মানুষের ছড়াছড়ি চারপাশে, যাদের তোমরা চেনো, তোমরা যাদের আয়নায় দেখতে পাও, আমি ওইরকম নই।'

এরপরে সন্তধর্মী চিত্রনাট্য দ্বিমুখী স্রোতে বইতে পারে। একদল মাথা উঁচিয়ে, বুক ফুলিয়ে বলেন, আমি অন্য, আমি ওদের মতো নই, তোমরা আমাকে দ্যাখো। দেখে শেখো। এঁরা নেতার ট্রেনিং-এ আছেন।

আরেকদল মুখ ফিরিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন, আমি অন্য, আমি ওদের মতো নই, তোমরা আমাকে বোঝো না। বুঝতে পারবে না। এঁরা শিল্পীর ট্রেনিং-এ আছেন। ইষ্ট আলাদা, সন্তধর্মটা কিন্তু একই, দু'দলেরই মহামানব হওয়ার সাধনা।

এইরকম গণনাট্য জীবনের ২৪ ঘণ্টাই আমাদের

ঘিরে সক্ষম হয়ে চলেছে, আমরা কেউ কেউ তাতে নায়ক নায়িকার ভূমিকা আলো করে থাকি, আর কেউ কেউ থাকি দর্শকের আসনে মুগ্ধ হয়ে। যাকে যেটা মানায়!

উপসংহারে অনু-নাটিকা
অন্যরকম মানুষের দুঃখ সুখ

দৃশ্য-১
স্ত্রী—জন্ম অবধি আমি অন্যরকমের মেয়ে
পুরুষ—জন্ম এস্তক আমি অন্যরকমের ছেলে
স্ত্রী—আমাকে কেউ বোঝে না
পুরুষ—আমাকে কেউ বুঝবে না
দু'জনে—কারণ আমার মতো এত নরম এত কোমল স্পর্শকাতর মন আর কারুরই নেই।

স্ত্রী—তাই আমি একা
পুরুষ—তাই আমি একক
স্ত্রী—তাই আমি অনন্যা
পুরুষ × তাই আমি অদ্বিতীয়
দু'জনে × তাই আমার তৃপ্তি নেই

স্ত্রী—তাই আমার শান্তি নেই
পুরুষ × তাই আমার সুখ নেই
দু'জনে × দূর. তৃপ্তি কে চায়?

দৃশ্য-২

স্ত্রী—কিন্তু শান্তি তো আমি চাই
পুরুষ × কিন্তু সুখ তো আমি চাই
দু'জনে × তাহলে কি আমি আরেকরকম?

স্ত্রী—তাহলে কি আমি অন্যরকম?
পুরুষ—তাহলে কি আমি এরকম নই?
স্ত্রী—তাহলে কি আমি সেইরকমও নই?
দু'জনে—তাহলে কি আমরাও ওইরকমই?
দু'জনে—না না তা কী করে হবে!

শেষ দৃশ্য-৩

স্ত্রী—কিন্তু সুখশান্তি কে না চায়?
পুরুষ—এবং বুঝদারি কে না চায়?
স্ত্রী—তাহলে কি ওরাও এইরকম!
পুরুষ × তাহলে কি ওরাও ওইরকম নয়?
দু'জনে × তাহলে কি ওরা আর আমরা...
দু'জনে × না না সে কী করে হবে!

কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যটি আমি কখনওই দেখিনি, লাস্ট বাস চলে যায় বলে উঠে আসি প্রত্যেকবার।

১২.০৪.০৮

এ

এবার
মলাট

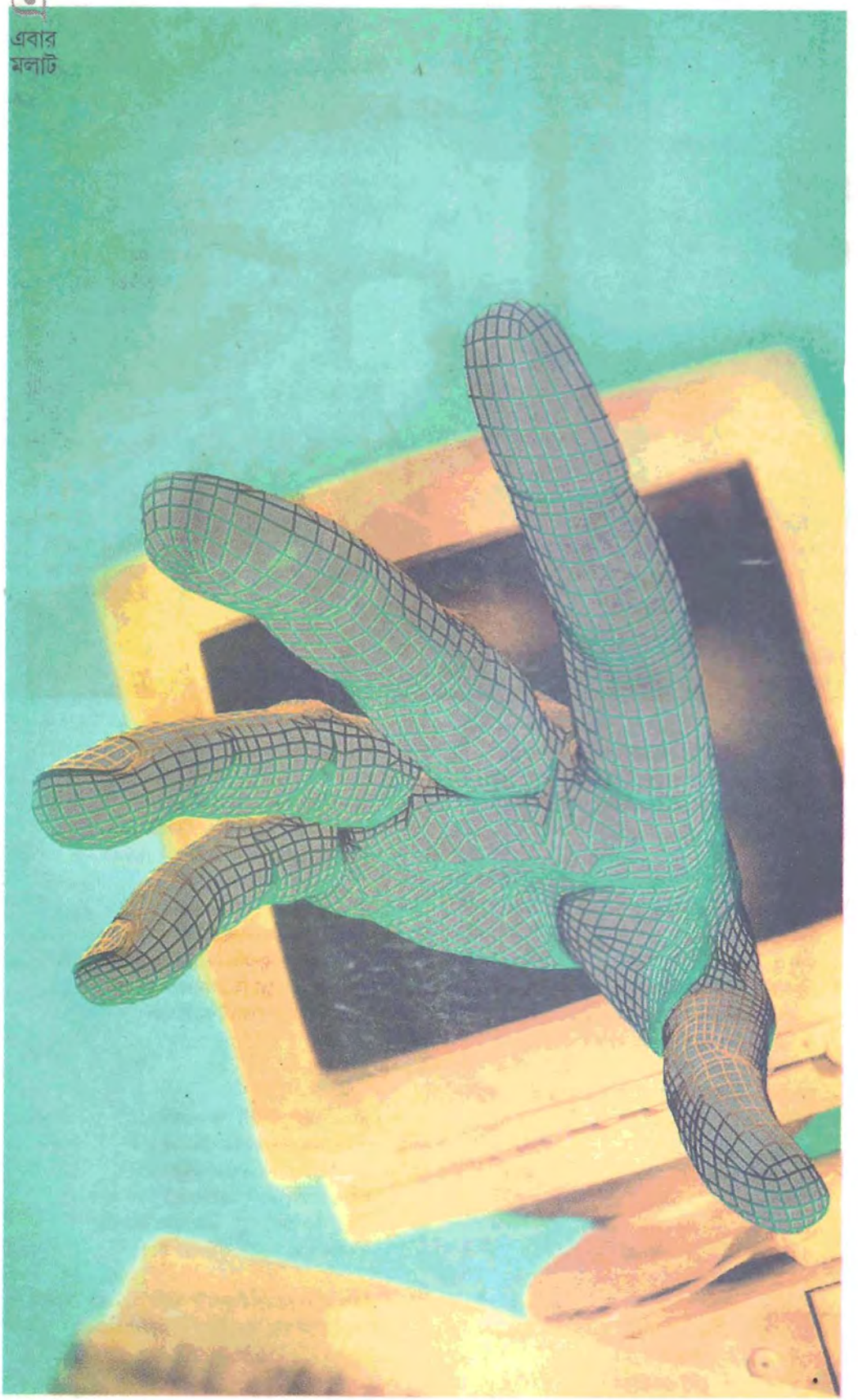

ব্লগবাজি

ব্লগ আসলে হল এতকাল চেপে রাখা, না ছেপে এক কোণে সরিয়ে রাখা, শুনতে না চাওয়া, বলতে না দেওয়া মানুষদের বিপুল রংবাজি।

রঞ্জন সেন

নিজের কথা নিজের মতো করে বলার সুযোগ সুবিধা বাংলাবাজার কেন, তামাম বিশ্ববাজারেই বেশ কম। ব্লগ-এর দৌলতে অবস্থা ইদানীং অনেকটা বদলেছে। 'আমি জানাতে পারিনি', 'বলতে পারিনি', 'সুযোগ পাইনি', 'কেউ চিনল না' গোছের বাতেলা দিলেই কেউ আপনাকে পাল্টা বলতে পারে—'কেন, ব্লগ করলেই তো পারতেন'? অনেককেই এখন গাইতে হবে 'আমার বলার কিছু ছিল না...না...না...'। ব্লগ হল ভারচুয়াল অথচ খুব রিয়্যাল একটা সীমানাবিহীন জমি। এখানে চিত্ত ভয়শূন্য, শির উচ্চ। খুঁতখুঁতে বস, আধপাকা কপি এডিটর, সময়ের অভাব, কাগজের পলিসি, প্রকাশনার খরচ, সেন্সরের কড়াকড়ি, বিজ্ঞাপনদাতার চাপ—যাবতীয় বাধা এড়িয়ে এ এক মুক্ত ভাবনার দেশ। কেউ খবরদারি করলে তাকে পাত্তা না দিলেও চলবে। হোমিওপ্যাথি ও হোমোস্যাপিয়েন্স—আকাশের নীচে যে কোনও কিছু সম্পর্কে জানান আপনার মতামত, তুলে ধরুন বিশ্লেষণ।

কীভাবে হাঁটবেন এই আকাশ সরণিতে? গুগল কিংবা উইকিপিডিয়ায় পাবেন গাদাগুচ্ছের ঠিকানা, যা আপনাকে বিষয়টি সম্পর্কে সড়গড় করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হ্যানোত্যানো না ভেঙে ন্যাকা করে বলা যাক, রেডিফ-ব্লগ বা ওয়ার্ডপ্রেস-এর মতো ব্লগ সাইটে যান, 'রেজিস্টার হিয়ার' বাটন দাবান। সাইটকে জানান আপনার পাসওয়ার্ড ও আই ডি উক্তি। এবার ট্যাগ লাইনে ব্লগটির নাম জানালে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার ব্লগ সাইট চালু। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি, ব্লগ-বক্তব্য কাটছাঁট করার সুবিধাও রয়েছে। আর কী বলব, ব্লগবৃত্তে একটু ঘোরাঘুরি করলেই আপনি এখানকার হালচাল বুঝে যাবেন। দেখবেন, আপনি একা নন, স্কুল থেকে টিনএজার, আস্তিক থেকে নাস্তিক—সবাই এখানে মহানন্দে হইচই জুড়ে দিয়েছে। এখানে পেয়ে যাবেন কড়ওয়া চৌথ থেকে ভ্যালেন্টাইনস ডে—সব্বাইকে। ব্লগবাজি আসলে হল এতকাল চেপে রাখা, না ছেপে এক কোণে সরিয়ে রাখা, শুনতে না চাওয়া, বলতে না দেওয়া মানুষদের বিপুল রংবাজি।

নতুন শতাব্দী কাজে ও ভাবনায় সমাজের কাছে নিজের আউটপুটটুকু পৌঁছে দেওয়ার ভাবনার পালে যে বাতাস লাগিয়েছে, আবিষ্কার করেছে মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা, ব্লগ তার অন্যতম একটা মাত্রা। প্রকৃত অর্থেই এ এক আন্তর্জাতিক সমাজ। এখানে সবার অবারিত দ্বার। ক্যালিফোর্নিয়ার এক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের সাম্প্রতিকতম উদ্ভাবন বা থিসিসের ব্যাপারে নিজের মতামত জানাতে পারবেন কলকাতার কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের কোনও ছাত্র। কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, নেই কোনও অকারণ সমীহ। ভরপুর গণতন্ত্র। কেউ কাউকে চেনেন না, জানেন না, বেড়ে ওঠা ও টিকে থাকার বিস্তৃত ব্যবধান সত্ত্বেও নিজের নিজের ভাবনাচিন্তার জমিতে দাঁড়িয়েই এখানে দু'জন বিপুল তর্কে মেতে উঠতে পারেন। লেখা-রেখা-অডিও-ভিডিও সবকিছু সাজিয়ে মত বিনিময় ও প্রতিক্রিয়া জানানোর সুবিধা ব্লগের দিগন্তকে বিস্তৃত করেছে। ব্যক্তিগত দিনলিপির এ যেন এক নতুন রূপ। এর বিষয় ও বিস্তৃতি গ্লোকাল, অর্থাৎ যা কি না একই সঙ্গে গ্লোবাল ও লোকাল। ম্যাগাজিন কিংবা সংবাদপত্রে মতামত জানানোর জন্য চিঠিপত্রের সুযোগ রয়েছে, টিভিতে রয়েছে ফোন ইন; কিন্তু কোনওভাবেই তা ব্লগের মতো বহুধাবিস্তৃত, দ্রুত ও অবাধ নয়। রঙিনও নয় অতটা। আকারে ছোট কিংবা বড় মিলিয়ে একজনের ব্লগের ওপর আর একজনের মন্তব্য। আবার, তা পড়ে অন্য একজনের জবাব—লেখকের মন্তব্য—সবকিছু মিলিয়ে ব্লগের মধ্যে দিয়ে যেন চেহারা পাচ্ছে মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত বহুত্বের ভাবনা। ব্লগোস্ফিয়ারে প্রতিনিয়তই ঘটছে তথ্য-তত্ত্বের নতুন নতুন বিস্ফোরণ। আর এর হাত ধরেই ব্লগ হয়ে উঠছে নতুন শতাব্দীর লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা।

বিল ল্যামিন এক স্কুল শিক্ষক। বয়স, ৫৯। বেশ কয়েক বছর আগে ঘরদোর সাফ করতে গিয়ে বিল আচমকা পেয়ে যান তার ঠাকুরদার লেখা কিছু চিঠি। ২৫তম আর্মি ডিভিশনের ইয়র্ক অ্যান্ড ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেন্টের সদস্য হিসেবে তার ঠাকুরদা উইলিয়াম হেনরি বনসার ল্যামিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি বাড়িতে নিয়মিত চিঠি পাঠাতেন। তাতে থাকত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, ট্রেঞ্চের জীবন নিয়ে এমনই কিছু চিঠি। সেনাপোশাক পড়া ঠাকুরদার ছবি সমেত বিল তুলে দিয়েছেন তার ব্লগে। তারপরেই হইচই। চিঠিগুলো পড়ে অনেকেই বিলের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। পড়তে চাইছেন আরও চিঠি। বহু প্রবীণ মানুষেরই মনে পড়ে যাচ্ছে তাদের বাপ-ঠাকুরদার কথা, যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। ৯০ বছর পরে এই পারিবারিক চিঠিগুলো ফিরিয়ে এনেছে তাদের সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি। যোগাযোগ ও প্রকাশনার জটিলতা, খরচ—এসব এড়িয়েই হয়তো কোনওদিন এমনই ব্লগবাহিত কোনও চিঠি/দিনলিপির সুবাদে আমাদের কাছে হাজির হবে মাও-কে ইংরেজি শেখানোর মতো অতীত কোনও বৃত্তান্ত।

আগেই বলেছি, লেখা-রেখা, ফোটো, ছবি, আবহে সেজে ওঠে একটি ব্লগ। এর পাশাপাশি থাকে সমগোত্রীয় অন্য ব্লগ, ওয়েবসাইটের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য সংযোগসূত্র। এই হল লিঙ্ক ব্লগের একটা বৈশিষ্ট্য।

ধারাবাহিকতার প্রতিষ্ঠিত নিয়মটি ব্লগবৃত্তে উল্টে যায়। অতীত থেকে বর্তমানে নয়, ব্লগের যাত্রা বর্তমান থেকে অতীতে। এনট্রিগুলো এভাবেই সাজানো হয়। বিষয় বা ব্যক্তি অনুযায়ী ব্লগেরও রকমফের রয়েছে। কোনও ব্লগ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের খবরাখবরের ওপর মতামত জানায়। অনেক ব্লগ আবার দিনলিপি। লেখক সেখানে কোনও একটি বিষয় বা অভিজ্ঞতায় ভর দিয়ে তার বিশ্লেষণ জানিয়েছেন।

দিনে দিনে বাড়ছে ব্লগের সাম্রাজ্য। গত বছরের শেষ দিকে ব্লগ সার্চ এঞ্জিন টেকনোর‍্যাটি খোঁজ পেয়েছে এক কোটি কুড়ি লক্ষেরও বেশি ব্লগের। GEnie, BiX-এর মতো ইউজনেট ও কর্মাশিয়াল অনলাইন সার্ভিসেস কিংবা আরও পুরনো আমলের কম্পুসার্ভ ই-মেল লিস্ট এবং বুলেটিন বোর্ড পেরিয়ে ব্লগ আজকের চেহারায় এসেছে। Weblog কথাটা প্রথমে ব্যবহার করেন জন বার্জার ১৯৯৭-এর ১৭ ডিসেম্বর। তারও দু-বছর পর পিটার মিরহোলজ তার সাইড বারে এই শব্দটাকে ভেঙে লিখতে শুরু করেন We blog। ব্লগ একইসঙ্গে কর্তা ও কর্ম। নাউন এবং ভার্ব। 'To blog' বলতে বোঝায় কারও ওয়েবলগ edit করা কিংবা post করা।

১৯৯৯ থেকে সাইবার দুনিয়ার ব্লগ শব্দটি চালু হয়ে গেলেও মানুষের মুখে মুখে কথাটা উঠে আসতে আরও বছর দুয়েক লেগেছে আকার ও অন্তঃসারে খবরের পৃথিবীটাকে নানাভাবে প্রসারিত করছে ব্লগ। প্রতিদিনই ব্লগ বৃত্তে আসছে নতুন নতুন বৈচিত্র। যেমন ট্র্যাফিক ক্যামেরায় একটা লিঙ্ক তৈরি করে ব্লগাররা তার সাহায্যে খবরের কাগজ ও চিঠি চ্যানেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাদ্রিদে বিশাল সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বিক্ষোভের ছবি দেখিয়েছেন। ব্লগের কল্যাণে তৈরি হচ্ছে খবরের নতুন নতুন সোর্স। কোনও নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত প্রথম শ্রেণির বিশেষজ্ঞ থেকে ম্যানেজমেন্ট স্কুলের পড়ুয়ারা তাদের নতুন উদ্ভাবন, গবেষণা ও তথ্যের সাহায্যে কোনও ঘটনাকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছেন। এতকাল রিপোর্টার, বা কাগজের নামী কলম লিখিয়েরা এই সাধারণ 'সোর্স'গুলির দিকে তেমনভাবে তাকাননি। বহুক্ষেত্রেই এতে লেখার মান বেড়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে ইরাকের যুদ্ধ, সিঙ্গুর থেকে সুনীতা উইলিয়ামসের মহাকাশ যাত্রা— চলমান সব ঘটনাবলিই নিয়মিত উঠে আসছে ব্লগে। রাজনীতি, খেলাধূলা, পরিবেশ—সবকিছুতেই ব্লগ জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব। আর ব্লগের ক্ষমতা? র‍্যাথারগেট স্ক্যান্ডালের কথাই বলি। টিভি সাংবাদিক ডন র‍্যাথার তার সিবিএস শো ৬০ মিনিট-এ এমন কিছু তথ্য পেশ

করেছিলেন, যা বুশের মিলিটারি সার্ভিস রেকর্ডের সঙ্গে মেলেনি। ব্লগাররা প্রমাণ করেন ওই নথিগুলি জাল। সিবিএস ভুল স্বীকার করে বলে, তাদের রিপোর্টিংয়ে ত্রুটি ছিল। সুনামি থেকে হারিকেন কাটরিনা, সাম্প্রতিক কালের সব বিপর্যয়ের সময়ই খুব ভাল কাজ করেছেন ব্লগাররা। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা থেকে ব্লগারদের এসএমএস টেক্সট মেসেজিং-এ ধরা পড়েছে ক্ষয়ক্ষতি ও বিধ্বংসী বিপর্যয়ের ছবি। বহু এলাকাতেই মেনস্ট্রিম মিডিয়ার সাংবাদিকরা পৌঁছনোর আগেই স্থানীয় ব্লগারদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনেছি আমরা। প্রথম প্রথম খুব একটা পাত্তা দিতে না চাইলেও ব্লগের গুরুত্ব এখন স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন কুলীন মিডিয়া ব্যারনরা। গার্ডিয়ান ইতিমধ্যে চালু করেছে রোজ এক পাতার ব্লগ ডাইজেস্ট। বিবিসি নিউজও তার এডিটরদের জন্য চালু করেছে একটি ওয়েবলগ। ব্লগ সার্চ এঞ্জিনের সংখ্যাও কম নয়—ব্লগডিগার, ফিডস্টার, টেকনোর‍্যাটির পাশাপাশি রয়েছে ব্লগ কমিউনিটি অ্যান্ড ডিরেক্টরি, ব্লগ ক্যাটালগ, মাই ব্লগলগ। সব মিলিয়ে ব্লগের সংসার এখন বেশ জমজমাট। ব্লগাররা কিন্তু মেনস্ট্রিম মিডিয়ায় তাদের বরণ করে নেওয়ার ব্যাপারটাকে খুব একটা পাত্তা দিতে রাজি নন। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যের পথ ধরে যে ইচ্ছে-গাড়ি তারা চালিয়েছিলেন, সেই রাস্তাতেই তারা থাকতে চান। এরা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, ব্লগ কোনও পত্রিকার পাদটীকা বা চ্যানেলের ফিলার নয়, এটা জানা ও জানানোর সম্পূর্ণ আলাদা একটা মাধ্যম। এ যেন এক দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, যা চরিত্রে ব্যক্তিগত হয়েও আদ্যন্ত সামাজিক। ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া ব্লগকে তাদের পরিবারে ঢুকিয়ে তাকে পরিবারের মধ্যেই বিলীন করে দিতে চাইলেও ঘটনা ঘটছে ঠিক উল্টো। এমনকী, অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সাংবাদিকরাও খুলে ফেলেছেন তাদের ব্লগ, যা কিনা কাগজের লেখালেখির বাইরে তাদের একান্ত নিজস্ব পরিসর। অনেকে আবার তাদের ব্লগগুলির ওপর ভিত্তি করে লিখে করে ফেলেছেন বই। সেগুলিও ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়। যেমন যৌনতা বিষয়ক ব্লগ লেখার জন্য বিখ্যাত টাকার ম্যাক্স-এর বই ইতিমধ্যেই জায়গা পেয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস-এর বেস্ট সেলার তালিকায়।

জনপ্রিয়তার হাত ধরেই আসে সমালোচনা, আসে অভিযোগ। ব্লগারদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অভিযোগ উঠেছে ব্লগাররা কোনও কপিরাইটের তোয়াক্কা করেন না। মেনস্ট্রিম মিডিয়ার মতো তারা অত দায়িত্বশীল নন। তাদের খবর, তথ্য, বিশ্লেষণ ও মতামত প্রকাশে ব্যক্তিগত মত প্রতিষ্ঠা, নিজের পর্যবেক্ষণকেই অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ঝোঁক থাকছে। ঘটছে মানহানির ঘটনা। ভালোর চাইতে এতে খারাপই বেশি হচ্ছে।

যাই হোক না কেন, ব্লগ এখন একটা বাস্তবতা এবং আমাদের ভুবনগ্রামের সব প্রান্ত থেকেই এই ব্লগবৃত্তে ঢুকে নিজের মত প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠা মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ব্লগকে যদি আমরা সাংবাদিকতা ও লেখালেখির একটা এক্সটেনশন বলে ধরে নিই, তা হলেই বা ক্ষতি কী? সারাজীবন লেখার কথা ভাবেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গম্ভীর করিডোর, ক্লাসরুম, ল্যাব, বোর্ড রুমের বাইরে যাদের চিন্তা ও কাজের কথা বাইরের পৃথিবী জানতে পারেনি, তারা আসছেন ব্লগে। গৃহবধূ থেকে গবেষক, কর্পোরেট লইয়ার থেকে কলমচি, খেলোয়াড় থেকে খ্যাদানে রাম—সবাই ব্লগবৃত্তে এসে খুঁজে পাচ্ছেন আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম। তাদের কণ্ঠস্বর শুনছে, ভাবনার শরিক হচ্ছে এক অশ্রুত, অদৃশ্য সমাজ।

প্রথমে খেয়ালখুশি মতো বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য আলগা লেখালেখি থেকে শুরু হলেও ব্লগার কমিউনিটি ক্রমশ সংহত হতে শুরু করেছেন। ব্লগের মাধ্যমে পরামর্শদান, বিশেষজ্ঞের মত পেশ করা এখন অনেকেরই জীবিকা। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলে তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের লোকদের পরামর্শ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবাও দিচ্ছেন। যেমন ওম মালিকের ব্লগ, গিগা ওম। টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে হামেশাই বহু ব্রেকিং নিউজ থাকে এই ব্লগে। বিশেষজ্ঞদের জনপ্রিয় ব্লগ সাইটগুলি এখনও মূলত ব্যক্তিনির্ভর। ব্লগার নিজেই লেখক থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সবকিছুই। স্বল্প বাজেটে কাজ চালানোর জন্য বেশি লোকও রাখা যায় না। আবার ব্লগের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য মানসিক চাপও থাকে প্রচুর। এর জেরে অনেকে আবার অসুস্থও হয়ে পড়েন। সম্প্রতি ওম মালিকই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফোর্বস, রেড হেরিং, সম্প্রতি বন্ধ হওয়া বিজনেস টু পয়েন্ট

ইন্টারনেট একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। ব্লগ এতে যোগ করেছে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিজম-এর একটা মাত্রা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ড্রাগস, এড্‌স প্রভৃতি ব্যাপারে সামাজিক সাক্ষরতা গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্লগ একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্লগ থেকেই উন্মোচন হতে পার্টিসিপেটরি জার্নালিজমের নতুন দিগন্ত। তবে নিজের মতো করে হক কথা বলার অধিকারকে আরও উদ্ভাবনী ভাবে ব্যবহার করার কথাও ভাবতে হবে ব্লগারদের। নইলে ব্যাপারটা উচ্চকোটির নেটিজেনদের ভাবনার বাইরে বেরবে না। ইতিমধ্যে ব্লগেও আসছে নানা ক্ষেত্রের স্বাধীন চিন্তা, গঠনমূলক মতামত। রাজনৈতিক দল-সরকার-বিরোধী দল-বণিকসভা ইত্যাদির বাইরে সাধারণ মানুষেরা ব্লগের মাধ্যমে তাদের মতামত জানাতে শুরু করেছেন। শুধু গ্লোবাল কেন, লোকাল ইস্যুও তো রয়েছে। ধরা যাক, বড়বাজার এলাকায় বহুতল বাড়িগুলি সহ গোটা এলাকায় কীভাবে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে, কীভাবে রোখা যেতে পারে বেআইনি নির্মাণ, বেআইনিভাবে কারা দাহ্য পদার্থ মজুত করছে ঘিঞ্জি এলাকায়—সবকিছুই মানুষের সামনে নিয়ে আসতে পারেন ব্লগাররা। স্থানীয় ব্লগারদের চাইতে এসব কথা আর কারা ভাল জানবেন? এই খোলামেলা মত বিনিময়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে আগামিদিনের প্রেশার গ্রুপ, ফোরাম। সমস্যা-সমাধান-উন্নয়ন-উন্নতির আলোচনায় অনাহূত আপনার-আমার মতো মানুষজন ব্লগের মাধ্যমেই সংগঠিতভাবে ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে দিতে পারেন তাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর। তথ্য ও তত্ত্বের ব্লগবাহিত ঢেউ দেশের দণ্ড ও মুণ্ডের কর্তাদের দরবারে আছড়ে পড়লে, আর কিছু না হোক, 'আমরা জানতাম না', 'তাই নাকি' গোছের ভুল বকা কমবে। একই সঙ্গে এসব সমস্যা পৌঁছে যাবে ভুবনগ্রামের নানা প্রান্তে। কেউ সমস্যা দেখে চমকাবেন, আবার কেউ খুঁজে পাবেন তাদের সমস্যার সঙ্গে আমাদের সমস্যার মিল ও অমিল।

সত্যিই এত কিছু হবে, এত কিছু সম্ভব—আপনি তাই ভাবছেন তো! পৃথিবীর অন্তত সিকিভাগ মানুষ যদি কোনওকিছুর তোয়াক্কা না করে নিজের গলায় কথা বলে ওঠে, জানায় নিজের মনের কথা—কী হবে, ভাবতে পারছেন? ব্লগ আমাদের ভাবনার পালে বাতাস লাগাচ্ছে, আমরা শুনছি মানুষের স্বাধীন কণ্ঠস্বর।

জিরো ইত্যাদি ম্যাগাজিনে নিয়মিত প্রযুক্তি ও ব্যবসা নিয়ে লেখার সুবাদে ওম-এর একটা পরিচিতি আছে। পার্সোনাল ব্লগ হিসেবেই গিগা ওম-এর জন্ম। তারপর কাজ বাড়তে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের আমন্ত্রণে নিজের উদ্ভাবনী ব্লগগুলিকে একটা ব্যবসায় ট্রান্সফর্ম করেন তিনি। শুরু করেছিলেন ব্যক্তিগত ভালবাসা থেকে। এখন তার সঙ্গে কাজ করছে সিইও, এডিটর সব মিলিয়ে প্রায় বারোজন।

ব্লগ ইনফো-এজের শ্রেষ্ঠ উপহার। এখানে তথ্য জানা ও জানানোর পাশাপাশি ভাবনাচিন্তার মুক্তি ও স্বাধীনতা খুঁজতে ব্যস্ত মানুষ। বড় নাম, কাগজ, ম্যাগাজিন—কিছুই তার দরকার নেই—ব্লগ হল হাঁকডাক ভরা মিডিয়া পৃথিবীতে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ানো এক রঙিন প্রজাপতি। এই বিচরণক্ষেত্র তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের হাত ধরে বাড়ছে। এবছরই ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ২০১০-এ এই সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে দশ কোটি। এই বৃদ্ধির হাত ধরেই বাড়বে ব্লগারদের সংখ্যা।

বহুত্ববাদের নতুন অভিজ্ঞান ব্লগের বিশাল সম্ভাবনার এখনও অনেকটাই উন্মোচিত হয়নি। ব্লগ পারে সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে জরুরি কোনও বিষয়কে প্রভাবিত করতে, গড়ে তুলতে পারে একাধিপত্য ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। ইরাকের যুদ্ধ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন—ব্লগাররা তাদের এই শক্তির প্রমাণ রেখেছেন সর্বত্রই। রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে ব্লগ।

সাধারণভাবে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের কাজে

NIIT
Be more ambitious

8,50,000 IT & ITES Jobs by 2010 !*

NIIT Academy Announces Admissions for B.Sc.(IT) & M.Sc.(IT) Batches Session 2008

NIIT ACADEMY

Source : NASSCOM

UGC Recognized Career Degree Programs With 100% Placement Assistance

KOLKATA City: Camac Street: *30580544*; Shyambazar: *30280347*; Gariahat: *30080004*; Kakurgachi: *30180260*; VIP Road: *32944343*; Behala: *24478746*; College Street: *64551234*; Dunlop: *25789871*; Hazra: *24851770*; Jadavpur: *24130194*; Majerhat: *65260131*; Salt Lake: *64509596*; Tollygunge: *24818390*. Suburbans : Barrackpur: *32951653*; Barasat: *25423277*; Howrah: *64527073*; Shibpur: *26415367*; Madhyamgram: *25268793*. GUWAHATI City : Panbazar : *9954090991/2733026*. Authorized Prometric Testing Centres: Camac Street *30580546/9831155514*; Salt Lake: *6550588/9433238524*; Guwahati Panbazar: *2602537*

ব্লগ

ব্লগ ইন ব্লগ আউট

চলুন ব্লগ করি। নিজের মনে বকবক করি। তারকারা নেটাকাশে আছেন, মেঘে মেঘে বেলা হল কত, আপনিও নাম লেখান না ওই ব্লগোস্ফিয়ারে। উগরে দিন নিজের পাপ। ঝেড়ে ফেলুন গোপন অভিশাপ। শরীরে রয়েছে লেখা শরীরের ছাপ।

অনুব্রত চক্রবর্তী

আমির খান আমার বন্ধু! গত একমাস আমি আমিরের সঙ্গে উঠছি-বসছি, জগিং করছি, চিনের অলিম্পিক নিয়ে তর্ক জুড়ছি অথবা জেনে নিচ্ছি আমিরের নতুন ছবি 'গজনী'-র হালহকিকত। অথচ আমির খানকে আমি কখনও দেখিইনি! কী ভাবছেন? প্রলাপ বকছি? তাহলে রামা, সুইটি...ওদেরও জিজ্ঞাসা করুন। ওরাও আমিরের বন্ধু! আরও চমকাতে চান? পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনিও হয়ে যেতে পারেন আমিরের জিগরি দোস্ত। ইন্টারনেট খুলে বসুন। সোজা চলে যান আমির খান ডট কম-এ। নাম লেখান। কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার মেল বাক্সয় ওয়েলকাম মেল। পেয়ে গেলেন আমিরের জগতে ঢুকে পড়ার ভিসা! এবার পড়তে শুরু করুন আমিরের 'ব্লগ'—নিজের কথা, মতামত, প্ল্যান। তা সে সিনেমা হোক, ক্রিকেট হোক বা বন্ধুদের লেখা, আঁকার কারিকুরি। মোদ্দা কথা, আমির এখন তামাম ভারতের 'ব্লগোস্ফিয়ার'-এর সবচেয়ে হট ব্লগার।

কী বললেন? 'ব্লগ' মানে কী? তাহলে বছর দশেকের কোনও ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন। উত্তরের সঙ্গে বিনা পয়সায় পাবেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যর চাহনি! ইন্টারনেটে ঢুকে নিজের বক্তব্য জনতাকে জানানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের আর তর সইছে না। এই লেখা, তা সে যাই হোক না কেন, 'ব্লগ' নামে পরিচিত। আর এই ক্রিয়ার নাম হল 'ব্লগিং'। যারা এই কম্ম করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা অবশ্যই 'ব্লগার'। আর ব্লগারদের দুনিয়ার নাম 'ব্লগোস্ফিয়ার'। ভাবুন একবার। ইন্টারনেটে এক আলাদা বিশ্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের বক্তব্য ছুড়ে দিচ্ছেন নিজেদের মতো করে। আপনি সেই বক্তব্য পড়তে পারেন, তার পক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য করতে পারেন অথবা সবাই গর্দভ কিংবা স্বার্থপর ভেবে খুলে ফেলতে পারেন আনকোরা একটি ব্লগ—আপনার একান্ত প্রেম। আর এই প্রেমে পড়া থেকে পিঁড়িতে বসা অবধি আপনার খরচ পাঁচ থেকে দশ মিনিট মাত্র!

কী বললেন? এ আর নতুন কী? যুগযুগান্ত ধরে আমরা ডায়েরি লিখে চলেছি! এ তো ডিজিটাল ডায়েরি। খানিকটা ঠিক বলেছেন। ব্লগের প্যাটার্ন অনেকটা ডায়েরির মতো, কিন্তু দু'একটা তফাত আছে। প্রথমত, ডায়েরির মতো দিনক্ষণ মেনে ব্লগ লেখার কোনও চাপ নেই। ইন্টারনেট ব্লগ সাইট-এ সুব্যবস্থা আছে। আপনার সবচেয়ে টাটকা ব্লগটি সবসময় তালিকার ওপরে থাকবে। অর্থাৎ যাঁরা পড়বেন, তাঁদের পাতা উল্টে কষ্ট করতে হবে না। আর অন্য তফাতটিই হল মূল—ব্লগ কালচার-এ কোনও লুকোচাপার ব্যাপার নেই। কবে আপনার ডায়েরি অন্য কাউকে পড়তে দিয়েছেন মশাই! এ অধম একটা ডায়েরি একবার প্রকাশ করেছিল বটে আঁতেল মহলে, তবে খান-চারেক পাতা স্টেপল করে। আর বন্ধুপ্রীতির চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে সেই জং-লাগা পাতাগুলো এখনও রয়ে গিয়েছে স্টেপলারের হাতকড়ায়। ব্লগ কালচার, ডায়েরি কালচারের ঘাড় ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে! ডায়েরি কালচারে বঙ্গদেশের নববধূর পানপাতার আড়ালে রাখা ঈষৎ লালচে মুখচ্ছবি যদি দেখে থাকেন, তবে ব্লগ কমিউনিটি নিজেকে চেনানোর ব্যাপারে একশো ভাগ বিপ্‌স। সে কথায় একটু পরে আসছি। আগে ইতিহাস হাতড়ে নেওয়া যাক

নব্বই-এর দশকের গোড়ার দিকে ইন্টারনেট বিপ্লব শুরু। আর কী আশ্চর্য—সৃষ্টির আদি থেকেই এই ব্লগ ব্যাপারটা একটু একটু করে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। সাইকোলজিস্টরা প্রথমে ভেবেছিলেন, শুধুমাত্র একাকিত্ব কাটানোর জন্যই এই মাধ্যম ব্যবহৃত হবে। তখনও ডায়েরি বা রোজনামচার চল ছিল গত চোদ্দো-পনেরো বছরে ইন্টারনেটের ব্যাপ্তি এবং ব্যবহার বেড়েছে আর পাল্টেছে প্রায় প্রতোকদিন আউটসোর্সিং-এর যুগে 'চেঞ্জ' অর্থাৎ পরিবর্তন হতে পারে দিনে দু'বার-তিনবারও। আপনি সারাদিনের কাজকর্ম করে ঘুমোতে গেলেন। আপনার কাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল আমেরিকা। আপনি পরদিন যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন টেকনোলজি এগিয়ে গিয়েছে আরেক ধাপ। বিশ্বায়নের এই মজা। অনেকে বলেন চাপ আমরা পাগলের মতো সময়কে টেক্কা দিতে চাইছি হয়তো তাই। পারব কি না, কেউ জানে না। কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বায়ন মানুষকে আরও সামাজিক করে তুলেছে মনে হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার আখড়া হল ইন্টারনেট আর ব্লগিং কমিউনিটি। আপনার কথা চারপাশের লোক, মানে বাড়িতে বা অফিসে, মানছে না? চলে যান ব্লগোস্ফিয়ারে। উগরে দিন মনের কথা। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন খান পঞ্চাশেক বক্তব্য জড়ো হয়েছে আপনার সমর্থনে। চোখেমুখে ডোন্টকেয়ার ভাব আনুন। টেনে চুল বাঁধুন, ঠোঁটে সাধ্যমতো লিপস্টিক লাগান। 'ব্রেকফাস্ট বাইরে করে নেব' বলে গটগট করে বেরিয়ে আসুন বাড়ি থেকে। আপনার সঙ্গে আজ পঞ্চাশজন আছে, যারা আপনার কথা সমর্থন করে। ব্লগিং শুধুমাত্র হাবিজাবি লেখার অভ্যাস নয়, ব্লগিং মনের একটি অবস্থা, অর্থাৎ 'স্টেট অফ মাইন্ড'।

দিন পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্লগিং-এর চরিত্র বদলেছে।

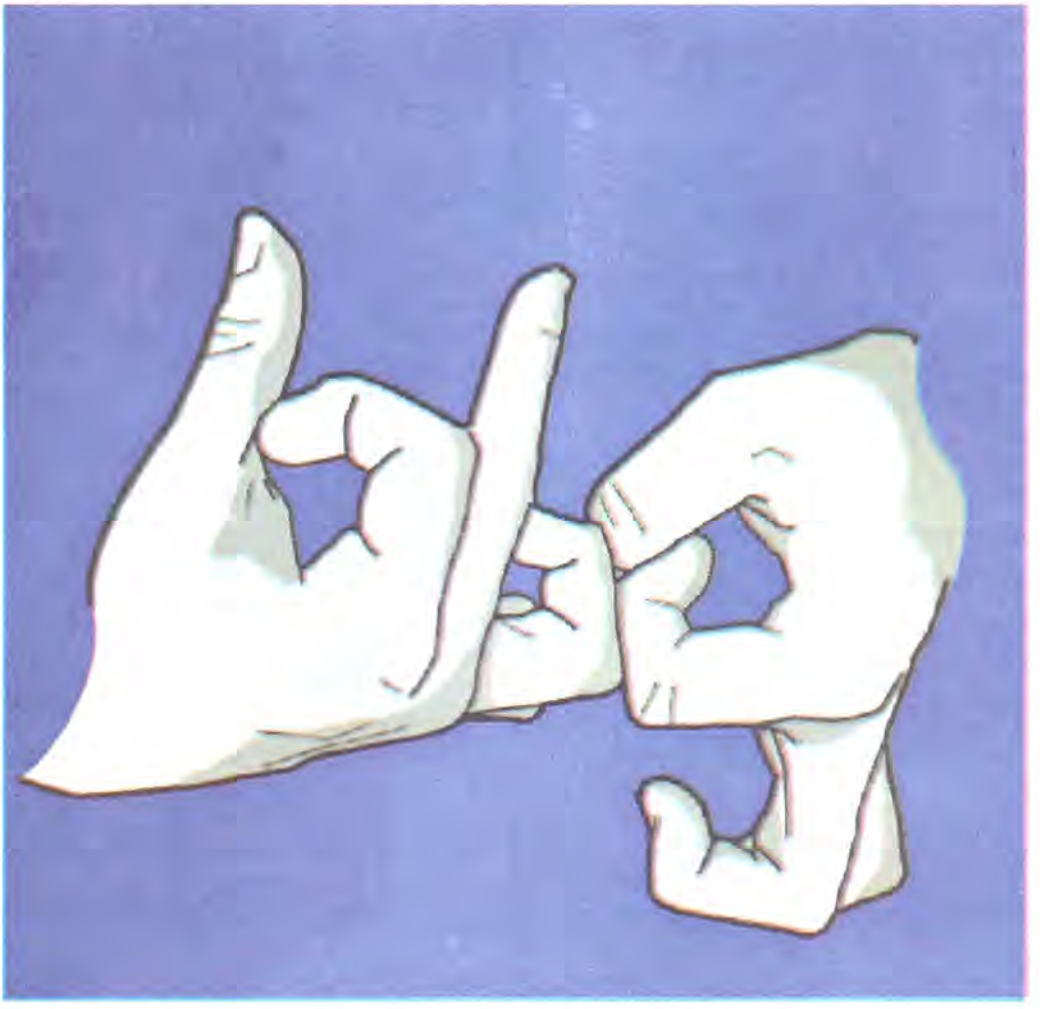

অনেকটা অফিসের পোশাকের মতো। আগে পরতেন জিনস, টি-শার্ট, বড়সাহেব কেবল হাসতেন স্যুট-টাই। মেজোসাহেব অমায়িক, তাই বিজনেস ক্যাজুয়াল। শুক্রবারে কিন্তু বাবা উড়নচণ্ডী লুক নিয়ে আসব, মায় হাফপ্যান্টও চলবে। ব্লগের কমিউনিটিও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কোনওটা সিরিয়াস, কোনওটা ক্যাজুয়াল আবার কোনও কমিউনিটি একেবারে বিন্দাস। কিন্তু যাঁরা লিখছেন, মানে ব্লগাররা, তাঁরা হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে লিখছেন। মনে করছেন, কেউ পড়বে। কেউ না পড়লেও লিখে যাচ্ছেন। এটাই মাহাত্ম্য। যেমন রেবেকা ব্লাড—১৯৯৪ থেকে একই ওয়েবসাইট-এ ব্লগ লিখে যাচ্ছেন। নিয়মিত। কোনও ক্লান্তি নেই। যে বিষয়ে মতামত জানানোর প্রয়োজন মনে করছেন, সেই বিষয়ে ব্লগ লিখছেন। এই দুনিয়ায় পল্লবগ্রাহিতাও একটা স্কিল! আগে আঁতলামোর নিদর্শন হিসেবে পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে বলতাম 'ডায়েরি লিখছি'। এখন জামার কলার তুলে বলি—'ব্লগ করছি'। জমানা বদলেছে।

২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে ট্রেন্ট লট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন সেনেটের এক নেতা, পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সপ্তাহ দুই আগে ট্রেন্ট কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন আরেক বর্ষীয়ান নেতা স্ট্রম থারমন্ডের জন্মদিনের পার্টিতে। মেনস্ট্রিম মিডিয়া, অর্থাৎ সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশন ট্রেন্টের মন্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ব্লগাররা ছেড়ে কথা বললেন না। ট্রেন্টের ওই মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যেই ব্লগোস্ফিয়ার ভরে গেল সমালোচনায় আর ট্রেন্টের পদত্যাগের দাবিতে। সমীক্ষা জানাচ্ছে, সেইসময় প্রায় চার শতাংশ মার্কিনী ব্লগোস্ফিয়ারে উঁকি মারতেন নিয়মমতো নিজেদের মতামত বাজিয়ে নেওয়ার জন্য। আর দৈনিক আড়াই লাখ ব্লগে ভরভরন্ত ব্লগসাইটগুলো। ট্রেন্ট প্রমাদ গুনলেন। তারপর পার্টির স্বার্থে ঝটিতি পদত্যাগ। নিন্দুকেরা বলেন, ব্লগাররা জোর করে ট্রেন্টের উটকো মন্তব্যগুলোকে রীতিমতো স্ক্যান্ডালের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মোদ্দা কথা হল, ব্লগোস্ফিয়ারকে রাজনীতিকরাও সমঝে চলতে আরম্ভ করলেন। এভাবেই 'ব্লগিং' জায়গা পাকা করে ফেলেছে সমাজ বিজ্ঞানের বইয়ের পাতায়। মনুষ্যসমাজের ওপর ব্লগের প্রভাব এখন সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণার অন্যতম বিষয়।

বছর পনেরো আগে ব্লগিং শুরু হলেও ব্লগের রমরমা কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

ব্লগের চরিত্র বদলেছে, ব্লগারদের বৈচিত্র বেড়েছে। নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি যা ছিল টিপিক্যাল দক্ষিণ কলকাতা ক্লাব কালচার, এখন তো পাল্টে গিয়ে উত্তরের খুল্লমখুল্লা রকবাজি। তার ফলে ব্লগোস্ফিয়ারে এসেছে বিভাজন। শুধুমাত্র আঁতলামো নয়। হইহই করে হাজির রাজনীতি, টেকনোলজি, প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরি, সাংবাদিকতা, কর্পোরেট, সেলেব্রিটি মায় ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির ব্লগ সাইট। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরের হিসেবে শুধুমাত্র টেকনোরতির ব্লগসাইটে লেখালিখির (মানে 'পোস্টিং') সংখ্যা দশ কোটির বেশি!

ব্লগ, ব্লগার, ব্লগোস্ফিয়ার নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, (আহা এমন সুযোগ যদি মিলত) তাঁদের মধ্যে আছেন, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, সাইকোলজিস্ট, সাংবাদিক, এবং ঐতিহাসিকরা। গবেষকদের বক্তব্য, আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে অর্কুট, লিংকডইন-এর মতো 'কমিউনিটি' সাইটে ক্যাজুয়াল ভাট বকার প্রবণতা কিছুটা কমবে। শুরু হবে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের তাড়না, যা কি না ব্লগরূপে আত্মপ্রকাশ করবে ওয়েব খাতায়! সমাজের ওপর কী চাপ পড়তে চলেছে, আশা করি বুঝতে পারছেন? ২০০৬ সালেই এই চাপ অনুভব করেন ওয়াশিংটনের পদস্থ আমলা বব স্টেনবাখ। তাঁর সহকারী জেসিকা কাটলার এক সকালে ঘুম থেকে উঠে কী মনে করে ব্লগ সাইটে পোস্ট করে দিলেন তাঁর আর বববাবুর গোপন যৌন জীবনের সাতকাহন। ফলত তৎক্ষণাৎ চাকরি থেকে বিতাড়ন। জেসিকা বিন্দুমাত্র দমলেন না—একটা আস্ত বই লিখে ফেললেন। স্টেনবাখও কম যান না। ব্লগার সমাজের ওপর ক্ষেপে লাল হয়ে জেসিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকে দিলেন। ব্লগের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে মনুষ্যমনের ওপর ব্লগের প্রভাব—অর্থাৎ ব্লগারদের ক্ষমতা। ব্লগার মানে কিন্তু সেলেব্রিটি নয়। আমজনতা। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির দুনিয়ায় হইচই সবচেয়ে বেশি। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিগুলো ওই ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি কি না! তাই ব্লগে কোন ধরনের তথ্য প্রকাশ করা যাবে বা যাবে না, ব্লগগুলো কেটেছেঁটে ওয়েবসাইট-এ ছাপা হবে কি না, সে ব্যাপারে বিস্তর জলঘোলা হচ্ছে। কিছু আইন আছে, আরও কিছু এল বলে। তবে এটা সত্যি, উল্টোপাল্টা ব্লগ জনপ্রিয় হয়ে গেলেও সমাজের কিঞ্চিৎ বিপদ। ব্লগ নিয়ে চিন্তার বিষয় মূলত তিনটি—গোপন তথ্য পাচার (সাইবার সন্ত্রাসবাদীরা মুখিয়ে বসে আছে), কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা বসেদের নামে চুটকি লিখে গলাধাক্কা এবং মিথ্যা লিখে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষ সম্বন্ধে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা। তবে এগুলো আটকানো যাবে বলে মনে হয় না। মাত্র তিরিশ বছরে সরকারবাবুর কেমন বদস্বভাব হয়ে গেল আর মানুষের হাজার হাজার বছরের স্বভাব কোন আইনে বদলাবেন?

কর্পোরেট বা সেলেব্রিটিরা আইন-টাইন নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। আইন থাকলে তার ফাঁকও থাকবে—কর্পোরেটের থেকে ভাল কেউ জানে কি? অতএব অভিনব উপায় বের করো এবং জনতাকে টুপি পরাও। ধরুন, আপনি ব্লগোস্ফিয়ারে ঘুরতে ঘুরতে একদিন থমকে দাঁড়ালেন একটি 'ভ্লগ'-এ। 'ভ্লগ' অর্থাৎ কি না ভিডিও ব্লগ। কোনও ব্লগারের পোস্ট করা অপূর্ব ভিডিওগ্রাফি আপনাকে হাঁ করে দিল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে আপনি ভিডিও দেখেন আর ব্লগ পড়েন। কোথায় তোলা এই ছবি, কোন ক্যামেরায়, ক্যামেরার গুণাগুণ ইত্যাদি। আপনার খেয়ালই নেই যে, এই ব্লগার (যার আসল নাম জানা শিবের অসাধ্য) কেবল একটি কোম্পানির প্রোডাক্ট নিয়েই লিখে যাচ্ছে দিনের পর দিন। উদ্দেশ্য? আপনার চিত্তচাঞ্চল্য। দৌড়ে গিয়ে যদি কিনে ফেলেন ওইরকম একটি ভিডিও ক্যামেরা! অতিরঞ্জিত মনে হচ্ছে? এই মুহূর্তে দু'টি মামলা চলছে মার্কিনমুলুকে—সোনি এবং ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে। ব্লগোস্ফিয়ারে দুর্নীতি রোখার জন্য চুল ছিঁড়ছেন কয়েকশো দুঁদে আইনজীবী।

সেলেব্রিটিরা কিন্তু হইহই করে ঢুকে পড়েছেন ব্লগোস্ফিয়ারে। ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন। যথারীতি উত্তেজিত ফ্যানসকল। রোজ সকাল বিকেলে নিয়ম করে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন ব্লগ—সংবাদপত্রের টেনশন বেড়ে যাওয়ারই কথা। মার্কিন মুলুকের সেলেব্রিটিরাই পথ দেখাচ্ছেন—হলিউড থেকে টেনিস কোর্ট। একটা ক্লোজ আপ শট দিয়ে অথবা দু'টো বাক হ্যান্ড মেরে জিরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে ব্লগিং করে ফেলেন জে লো অথবা আনা কুর্নিকোভা। এই তো সেদিন ব্রিটনি স্পিয়ার্স সুখ-দুঃখ ঢেলে দিলেন ব্যক্তিগত ব্লগে। কয়েক হাজার চোখের জল ফেলল। অ্যালেক বল্ডউইন, ব্রুক উইলিস, ডেভিড ডুকফনি, নিল ইয়ং নিয়মিত ব্লগ লিখছেন বিভিন্ন বিষয়ে। অ্যালেক বল্ডউইন তাঁর নতুন ছবি নিয়ে দু'চার কলম লিখলেন তো নিল ইয়ং এক পাতা পোস্ট করলেন তাঁর অ্যালবাম 'লিভিং উইথ ওয়ার' সম্বন্ধে। নারীসমাজ তৈরি হয়েছে ব্লগোস্ফিয়ারে—প্যামেলা অ্যান্ডারসন, প্যারিস হিলটন থেকে স্পাইস গার্ল পর্যন্ত। ব্লগ দুনিয়া বড় না হলে জানাই যেত না যে, এমসি হ্যামার নাচ বা হিপ হপ ছাড়াও বেসবল তার ধর্ম-কর্ম নিয়ে কতক্ষণ সময় কাটান। বারাক ওবামাও শুরু করেছেন পোস্ট করতে। তবে ওঁর কমিউনিটি ফোরাম বেশি পছন্দ। চলে যান লিংকডইন-এ। বারাক ওবামা কী কেন, কোথায় কবে উত্তর পেয়ে যাবেন। বিল ক্লিন্টনের ব্লগ লেখে উত্তেজিত হবেন না—ওটি নকল। যে কোনও হেমিস্ফিয়ারেই যখন সৎ আর অসৎ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাজার করেন, তখন ব্লগোস্ফিয়ার কী দোষ করল! অর্থাৎ বেনোজল ঢুকে পড়েছে। আর এই বেনামী ইন্টারনেট বাজারে আসল-নকল খোঁজার চেয়ে নিজের নামে একটা ব্লগ খুলে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে আমরা, বিশেষ করে বঙ্গসন্তানরা, শুধু লক্ষ করছি ব্যাপারটা, যেমন করে থাকি অন্যসব বিষয়ে—রাজনীতি থেকে ফুটবল, শকুনির পাশা থেকে বিপাশা! জ্ঞান পিপাসা কমে যাচ্ছে দিনদিন। তবে সমস্যা একটা আছে। ভারতের মতো দেশে ব্লগ জনপ্রিয় হতে গেলে ইন্টারনেটে প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার বাড়াতে হবে। এবং তার জন্য চাই সহজলভ্য উন্নত টেকনোলজি। হচ্ছে না যে তা নয়, তবে স্বাবলম্বী হতে কিছুদিন সময় লাগবে। ইংরেজি অক্ষরে বাংলা লিখে হাতের সুখ হতে পারে কিন্তু মন ভরে কি! অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্লগের জনপ্রিয়তা এদেশে একটু কম হওয়ার কারণ আমজনতার সাইকোলজি। জিন তো বদলাতে পারবেন না। যতই

হুইস্কি বা ভদকা খান! কমিউনিটি ওয়েবসাইটগুলো খেজুর আর পিএনপিসি (পরনিন্দা পরচর্চা) করার আদর্শ জায়গা। পাড়ার রক ইন্টারনেটে স্থানান্তরিত হলে যা হয়। শাশ্বতীর স্ক্র্যাপবুকে অর্পিতা কিছু লিখে দিল, কিন্তু যাকে লেখা, সে পড়ার আগেই পড়ে ফেলল স্বাতী! ব্যস! কলকাতা, লন্ডন, ব্যাঙ্গালোর এলোমেলো হয়ে গেল অর্কুট-এর ঠেক-এ। তবে আস্তে আস্তে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মানসিকতার বাপ-মা, দাদু-ঠাকুমারা পরিবর্তন সামলে চলতেন এখন পরিবর্তন আমাদের সামলাচ্ছে। তাই অর্কুট, লিংকডইন ছেড়ে অনেকে চলে যাচ্ছেন ব্লগোস্ফিয়ারে, যেমন ব্লগস্পট। মিনিট পাঁচেক মাত্র। একটা আস্ত ব্লগসাইট নিখরচায় বানিয়ে দিল ইয়াহু—'যখন মেঘেরা ডাক পাঠায়' চমৎকার। যাকে ইচ্ছে তাকে পাঠান। উটকো ঝামেলা নেই।

সান্দ্রা গিজেল। ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স অ্যাকাডেমির শিক্ষিকা। গ্রেফতার হলেন। ঘোরতর অভিযোগ। ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরদের সঙ্গে তিনি নাকি যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছেন। কোর্টে অভিযোগ আনা হল ধর্ষণের। সরকারি উকিল যত্ন নিয়ে কেস সাজালেন। সাক্ষীসাবুদ জোগাড় হল। সান্দ্রার আইনজীবী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। হঠাৎ কানে এল, কোনও একটি ব্লগসাইটে এ ব্যাপারে মুখ খুলেছে ধর্ষিত কিশোরের স্কুলের বন্ধু। নাম অবশ্য জানা যাচ্ছে না। কিন্তু সে পরিষ্কার লিখেছে, পুরো ব্যাপারটিই নাকি সাজানো। ওই শিক্ষিকাকে প্যাঁচে ফেলার জন্য কেউ বা কারা এই দুষ্কর্মটি করেছে। সান্দ্রার আইনজীবী নতুন জীবন পেলেন। পত্রপাঠ সেই ব্লগ পাঠিয়ে দিলেন জজসাহেবের কাছে। জজসাহেব দণ্ড দেওয়ার জন্য কলম বাগিয়ে বসেছিলেন। ব্লগ পড়ে চশমা মুছে ফের ভাবতে বসলেন। ব্লগের কী মহিমা! এক সম্প্রদায়ের মানুষ চার্চে গিয়ে স্বীকারোক্তি করেন—পাপের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আরেক সম্প্রদায় মন্দিরে গিয়ে 'ঠাকুর ঠাকুর' করেন। নরেন্দ্রনাথ মা কালীর মন্দিরে 'জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও' বলে বলে আকুল হয়ে পড়লেন—এ তো বাস্তবিক এক মোনোলগ। অর্থাৎ, আমি আরেকজন রক্তমাংসের মানুষকে ভেতরের কথা বলতে পারছি না কোনও কারণে, তা সে লজ্জা হোক, ভয় হোক বা হীনমন্যতা হোক। কিন্তু অন্য কোনও অবলম্বন পেলে বাঁধন ভেঙে যাচ্ছে। তাহলে নিরীশ্বরবাদীরা কী করবেন? প্রোমোটিং-এর যুগে খোলা মাঠ বা আকাশ পাওয়া বেজায় শক্ত।

অতএব ব্লগ সাইট—কনফেশন ব্লগ। লগ ইন করো। পাপ উগরে দাও। পাঁচটা লোক পড়ুক। ছ্যা ছ্যা করুক। পাপস্খলন হল, বেশ হালকা লাগছে। আজ রাতে একটু বেরনো যাক! কিন্তু পাপস্খলন সত্যিই হবে কি না, তা নির্ভর করে পাপের মাত্রার ওপর।

মাইকেল মুলেন, বছর পঁয়ত্রিশের তরতাজা যুবক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন-এ হোয়াটকম কাউন্টির বাসিন্দা। ব্লগার। একদিন মাইকেলের বন্ধুরা তাঁর ব্লগসাইটে গিয়ে দেখলেন যে, মাইকেল একটি স্বীকারোক্তি করেছেন। স্বভাবতই সবার উৎসাহ বাড়ল। কিন্তু ব্লগ পড়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম! মাইকেল খুন করেছেন একাধিক ব্যক্তিকে। এবং সেইদিনই! যতক্ষণে সাংবাদিকরা খবর পেলেন, ততক্ষণে মাইকেল আত্মসমর্পণ করেছেন—পুলিশের জিম্মায়। জানা গেল, মাইকেল ইন্টারনেট থেকে কাউন্টির বাসিন্দা জেল ফেরত কয়েকজন দাগি আসামির ঠিকানা জোগাড় করেন। এরা প্রত্যেকেই কোনও কোনও সময়ে যৌন নিগ্রহ, ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খেটেছেন। মাইকেল নিজেকে এফবিআই এজেন্ট পরিচয় দিয়ে একটি বাড়িতে পৌঁছন এবং জনাকয়েক ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ির লনে বসে পানাহার করেন। তারপর হঠাৎই পকেট থেকে বেরিয়ে পড়ে বন্দুক। ঠান্ডা মাথায় বাড়ি ফিরে ব্লগসাইটে ধারা বিবরণ ও শেষে আত্মসমর্পণ। ১৯৯৯ সালে ব্লগার সফটওয়্যারটি বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্লগোস্ফিয়ারে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। পাইরা ল্যাবস সংস্থার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোডাক্ট। আগেই বলেছি, ইন্টারনেট সমাজে ব্লগ এখন একটি মানসিক অবস্থার মতো।

২০০৩ সালে এক ইরাকি ব্লগার 'সালাম প্যাক্স' নাম নিয়ে রোজনামচা লিখতে শুরু করলেন ইরাক যুদ্ধ নিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবীতে হালোড়ন পড়ে গেল। ওই বছরেই গুগল নিয়ে এল এক অভিনব সংযোজন—ব্লগের বিষয়ের ওপর বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপায়! বছরের মাঝামাঝি রাজনৈতিক ব্লগসাইটগুলো ভেসে গেল ছোট-বড়-মাঝারি বিজ্ঞাপনে। ২০০৪ সালে মেরিয়ম ওয়েবস্টার 'বছরের শ্রেষ্ঠ শব্দ'র শিরোপা দিল 'ব্লগ'-কে। এখন পৃথিবী জুড়ে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইট পুরস্কার ঘোষণা করছে—'শ্রেষ্ঠ ব্লগ', 'শ্রেষ্ঠ ব্লগার', 'শ্রেষ্ঠ ব্লগ কমিউনিটি' ইত্যাদি। ২০০৫ সালে ক্যালাকানিস পঁচিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এওএল (AOL)-কে বেচে দিলেন তাঁর ব্লগ। সারা পৃথিবীতে শুধু ব্লগসাইটে বিজ্ঞাপন বাণিজ্য দশ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। পরিসংখ্যান দেখলে চোখ কপালে উঠে যায়। ডায়েরি লিখে টাকা কামানোর কথা জন্মে ভেবেছেন! অবশ্য অনেকেই হিসেবনিকেশের ধার ধারে না।

যেমন দারশিল। কয়েকদিন আগে আমার বন্ধু গিয়েছিলেন ওর বাড়িতে, নিমন্ত্রণ। বন্ধু অর্থাৎ আমির খান। আমির যখন দারশিলকে দেখালেন, নিজের ব্লগসাইটে 'তারে জমিন পর'-এর সপ্রশংস আলোচনা, তখন তার আনন্দ কে দেখে! উত্তেজিত হয়ে আমিরকাকুর ব্লগসাইটে নিজেই লিখে দিল দু'চার লাইন। লিখল, নাচতে খুব ভালবাসে কিন্তু সিনেমায় ওকে নাচতে দেওয়া হয়নি, তাই খুব দুঃখ। ভাবা যায়! আর ভাববেন না। লেগে পড়ুন। তারা মাটিতে নেমে এসেছে। আপনারই বা 'তারা' হতে আপত্তি কীসের? চলুন ব্লগ করি।

সারা বিশ্বে ১৭০টি'রও বেশি দেশে

আন্তর্জাতিক রোমিং

পরিষেবায় BSNL MOBILE

এক দুনিয়া এক নম্বর

- ১৭০টি'রও বেশি দেশ, ২৭০টি নেটওয়ার্ক
- ভয়েস এবং এসএমএস
- একক (সিঙ্গল) বিল *(শর্ত প্রযোজ্য)*

BSNL
কানেক্টিং ইন্ডিয়া

বিশদে জানুন | ডায়াল ▶ ৯৪০০০ ২৪৩৬৫ | ক্লিক ▶ www.kolkata.bsnl.co.in www.calcuttatelephones.com

গোঁ

গোঁসাই বাগান

জয় গোস্বামী

এই কবিতা আমার কবিতা। কারণ, এই কবিতায় লেখা আছে আমারই জীবন। কেবল এই কবিতাটি লিখে গিয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমার চারদিকে

আমার চারদিকে কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন
তাঁদের মুখে
ঊষা তাঁর প্রসন্ন আবির ছড়িয়ে দিচ্ছেন

কবিদের কণ্ঠে গান জেগে উঠছে
যেন মন্ত্র।

একটু পরে আকাশে গ্রহণ লাগবে
কবিদের মুখগুলো তখন মনে হবে
অন্ধকার মুখোশের মতো

কিন্তু তাদের বুকের ভিতর
তখনও দ্বিপ্রহর মাদলের মতো
বাজতে থাকবে

আমার চারদিকে কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন
তাঁদের গান, তাঁদের কবিতার মন্ত্র নিয়ে...

অল্প বয়স থেকেই কবিদের আশ্রয়ে কেটেছে আমার জীবন। তাদের কারও সঙ্গে যে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, তা নয়। লেখা পড়েই আশ্রয় সন্ধান। আজও তাই।

এই এখন, এই যে গোঁসাইবাগান লিখছি, আমার চারদিকে কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন বলেই তো! অল্প বয়সে আমার বেঁচে থাকা ছিল কবিতায় আশ্রিত। আজও তাই কবিদের মুখ আমার কাছে বরাভয়ের আশ্বাস নিয়ে আসে।

কবিদের মুখ বলতে, কবিদের শব্দ। কেন না, মুখোমুখি আর ক'জনকে চিনতাম! ধরুন জীবনানন্দ, দেখার সুযোগ নেই, আমার জন্মের ১৮ দিন আগে মারা গিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এখনও মনে মনে কথা বলি। কবিতা সম্পর্কিত তাঁর কোনও গদ্য পড়তে পড়তে বাসে চলাফেরা ছিল আমার প্রতিদিনের অভ্যেস! নানা প্রশ্ন মনে জাগে, মনে হয় কী করে এটা বুঝলেন? ইস, আরও কয়েকটা কথা জিগ্যেস করে নিতে পারতাম যদি? এই যে, কী করে এটা বুঝলেন লেখক, এই কথাটা সবচেয়ে বেশি মনে হয় যাঁর সম্পর্কে, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকেও তো দেখার সুযোগ হয়নি। তাতে কী? কবিকে দেখার সেরা উপায় তো তাঁদের লিখিত শব্দগুচ্ছ, যা তাঁরা আমাদের জন্য রেখে যান।

এক্ষুনি যে বরাভয়ের কথা বলছিলাম, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটিতে যেন রয়েছে সেই বরাভয়ের মুদ্রা এই সব মুহূর্তে কবিদের মনে হয় যেন দেবতার মতো। তাঁদের কবিতা মন্ত্রের মতো যেন পরিশুদ্ধ করছে আমাদের কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। অবিরল শুদ্ধতার সঙ্গে, প্রসন্নতার সঙ্গে তো থাকতে পারে না জীবন। আকাশে গ্রহণ লাগে। জীবন তার নানা কুশ্রীতা, হীনতা, নিয়ে ঘিরে ধরে আমারও জীবনকে, তখনও কি কবিদের সেইসব আশ্চর্য কবিতা থেকে সমান সাড়া পাই আমি?

যখন মনে অন্ধকার নেমে আসে, ভালবাসা যখন আহত হয়, বিশ্বাস যখন ফেটে যায়, তখন তা থেকে বেরিয়ে আসে বিদ্বেষ যাকে একদিন ভালবাসতাম, যাকে সারাদিনে একবার না দেখলে মরে যাব মনে হত, তার সম্পর্কে তখন ঘৃণা জন্মায় ভালোবাসার উল্টো পিঠ ঘৃণা। সেই হল গ্রহণ লাগার সময়। তখন কেবল দ্বেষ। তখন কবিতাও যেন সান্ত্বনা দেয় না কালো হয়ে থাকে মন।

কবিদের মুখও তখন যেন মুখোশ কবিদের মুখ মানে? কবিদের শব্দই তো তাঁদের মুখ এমন অন্ধ গর্তে পড়ে যাই সময় সময়। বইপত্র থেকে শুধু ছাই ঝরছে মনে হয়। কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। যন্ত্রের মতো হাঁটাচলা করি। যন্ত্রের মতো অফিস যাই। বাড়ি আসি। তখন কেমন হয়? সব চিন্তা, প্রার্থনার সকল সময় তখন শূন্য মনে হয়

তবু আমার মন কালো হয়ে গিয়েছে বলেই তো আর কবিতাগুলো মলিন হয়ে যেতে পারে না। তাদের মধ্যে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোক তেমনই জ্বলতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে একদিন সেই অন্ধকার গুহা থেকে হয়তো বেরিয়ে আসার শক্তি পাই আমি। আলো পড়ে মনে। আবার লোক চলাচল শুরু হয় আমার মধ্যে। সেই গুহার বাইরে এসে দেখি, কবিরা ঠিকই দাঁড়িয়ে আছেন এই চরাচরের চারিদিকে। তাদের গান, কবিতা নিয়ে। আমি অন্ধকারে ছিলাম বলেই তো আর জগতের জ্যোতির্ময় কবিত্য সমুদয় নষ্ট হয়ে যায়নি

অন্যপক্ষে, আমার মতো পাঠকেরই শুধু নয়, কখনও কবির নিজের জীবনে নামতে পারে অন্ধকারের আচ্ছাদন। যখন সেই আঁধার-প্রভাবে তাঁর মুখকে দূর থেকে মনে হয় মুখোশ। সবাই দূরে সরে যায় তখন সেই কবির থেকে। সেই অন্ধকার সময় যখন পার হচ্ছেন কবি, তখন

তারও ভেতরে কোথাও জ্বলতে থাকে মধ্যাহ্ন। সূর্যালোক বাজতে থাকে মাদলের মতো। সেই মাদলের ধ্বনিই তখন আলো।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে আশা আগুনের মতো জ্বলেছে সারাজীবন। এই কবিতা তার একটি প্রমাণ। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশের হেঁটে চলা ধরা আছে এই কবির রচনায়। সেখানে নিজের উপর এসে পড়া একটি অন্ধকার মুহূর্তের বিবরণও কীভাবে দেয় তাঁর লেখা, একটু দেখা যাক।

আমার

কবিতা
তুমি কেমন আছো?

যেমন থাকে ভালবাসার মানুষ
অপমানে।

এ লেখার মধ্যে আছে কবিতার অপমানে থাকার কাহিনি। যদিও সে কাহিনি বিশদভাবে বলা হয়নি অপমানটুকু বলা আছে। বিষণ্ণতার দীর্ঘশ্বাস যেমন, একাকী, কাউকে কিছু না জানিয়ে মিশে যায় হাওয়ায় কবিতাও যেন কাউকে কিছু জানানোর জন্য লেখা নয় একাকী নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাতাসে মেশার জন্য লেখা। একটি প্রশ্ন, ও একটি উত্তর দু'টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে। লক্ষ করার মতো একটি আশ্চর্য এ কবিতায় রয়েছে, তা হল, কবিতার নামটি। 'আমার'। একটু অদ্ভুত লাগে প্রথমে নামটি শুনে। কিন্তু তারপর ভাবলেই একটি চাবি খুলে যায়।

শিরোনাম হিসেবে 'আমার' শব্দটি পড়ার পরই আমি কোন শব্দটি পড়ছি? শিরোনাম হিসেবে 'আমার' শব্দটির পরই, লেখার প্রথম লাইন হিসেবেও আমরা পাচ্ছি একটি শব্দ কবিতা। আমাকে পরপর দু'টি শব্দ পড়তে হল তাহলে, 'আমার কবিতা'।

কবিতাকে প্রশ্ন করছেন কবি, 'তুমি কেমন আছো'। উত্তরে জানতে পারছেন তার অপমানে থাকার কথা। অর্থাৎ, 'আমার কবিতা তুমি কেমন আছো?' অপূর্ব এই কারুকর্মটি। কবিতা সবসময় নিজেকে প্রকাশই করে না। কখনও গোপনও করে। সব কথা খুলে না বলাও কবিতার একরকম ধর্ম। এখানে আপাত সরল, দীর্ঘশ্বাসময় স্বগতোক্তির মতো এই কবিতাও আড়াল অবলম্বন করল।

কেন দরকার হল এই আড়াল?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় একাকী মানুষও সমগ্র মানুষের পরিচয় নিয়ে আসে। রাস্তার একটা ন্যাংটো ছেলে যখন তাঁর কবিতায় আকাশ দ্যাখে তখন সমস্ত পথবাসী শিশু এসে যায় আমার মনে। এবং পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনও সত্যিকার কবি জন্মাননি, যাঁকে অপমানিত হতে হয়নি। ক্ষুধার্ত আন্দোলনের শক্তিশালী কবি শৈলেশ্বর ঘোষ জানিয়েছিলেন একবার এরকম একটি কথা যে, 'কবি' শব্দটিই বিদ্রোহবাচক। জানিয়েছিলেন কবি মানে, যে বেঁকে বসে। কবি, তিনি যতই শান্ত মুখচোরা বা একাকী হোন না কেন, তিনি কোনও না কোনওভাবে সমাজে প্রচলিত নিয়মগুলোর বিরোধিতা করে চলেন। নইলে তিনি সত্য থাকতে পারেন না। এই বিরোধিতা যে তিনি সবসময়ে খুব জেনেশুনে, আঁটঘাট বেঁধে, পরিণাম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থেকে করেন, তা কখনওই নয়। তাঁর সত্য দৃষ্টি দ্বারা তিনি যা ঠিক মনে করেন, তাই করে থাকেন তাঁর লেখায় আর জীবনে। আর তাঁকে অপমানিত হতেই হয়। কখনও পদে পদে, কখনও বা সাময়িক কিছু বিরতির পর পর।

এই ছোট কবিতার প্রথম লাইনে, 'আমার কবিতা' বলা হলে অর্থাৎ 'আমার' শব্দটিকে নামিয়ে কবিতার body-র অন্তর্ভুক্ত করা হলে, তাতে কেবল বিশেষ একজন কবির নিজের কবিতার অপমান ঘটে যাওয়ার উল্লেখটুকু থাকত। অন্যপক্ষে, এখানে 'কবিতা' শব্দটি সম্বোধন হিসেবে আসায়, এক মুহূর্তে সমস্ত কবিতার প্রতি চলে গেল এই ডাক, এই প্রশ্ন। আবহমান কাল ধরে যত কবিতা অপমানিত হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল এই লেখা। কিটস থেকে জীবনানন্দ—নিষ্ঠুর সমালোচনায় আহত যাঁদের কবিতা—ফ্ল্যর দ্য মল নামক নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া বইয়ের কবি শার্ল বদলেয়ার থেকে আজকের দিনের কবি মলয় রায়চৌধুরি, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' নামক একদা-অশ্লীল-কিন্তু-আজ-স্মরণীয় কবিতাটির লেখার জন্য যাকে আদালতের কাঠগড়ায় আসামি হিসেবে দাঁড়াতে হয়েছিল মাত্র বছর চল্লিশ আগে, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সকলের সব অপমানিত কবিতাকে ছুঁয়ে দেয়, এই আপাত সামান্য, কবিতা নামের সম্বোধনটি। আজ, ২০০৮-এর দৃশ্যে এই কবিতা পড়ার সময় সমস্ত অপমানিত কবিকে মনে পড়ে আমার। আরেকদিকে, নাম হিসেবে 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করায় একদিকে যেমন 'আমার কবিতা' অর্থাৎ নিজের কথা বলে নেওয়াটাও হয়ে যায়, অন্যপক্ষে জগতের সমস্ত অপমানিত কবিতা হয়ে ওঠে আমার কবিতা। জগতের সমস্ত নিপীড়িত মানুষ, যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার সন্তান, ঠিক তেমনই। মনে রাখতে হবে, কবিতাটির নামকরণ করার সময়, 'আমার' কথাটি যে মুদ্রণকালে কবিতার তুলনায় বড় অক্ষরে, বোল্ড-এ, অপেক্ষাকৃত সাহসী বা জোরালো টাইপে ছাপা হবে, সে কথা নিশ্চয় জানতেন কবি। এই 'আমার' এক মুহূর্তে সকলের হয়ে গেল। মঙ্গলাচরণ যেমন লিখেছিলেন, 'এক নামে যেই ডাকলে অনেক হলাম যে একজনা। কানাইলালের মা আমার, ক্ষুদিরামের মা জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।' কানাইলাল বা ক্ষুদিরামের মা যেমন অনায়াসে আমার মা হয়ে যেতে পারেন, তেমনই। অথবা মৃদুল দাশগুপ্ত যেমন দেখেছিলেন 'একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে। চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের।' একটি মশাল সহস্র মশালকে জ্বালায়। মশালটি আর একা থাকে না।

বোঝা যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতা একটি একাকী বিষণ্ণতার, দীর্ঘশ্বাসের মুহূর্ত নিয়ে লেখা। হয়তো অতি সংক্ষিপ্ত এই কবিতা মাত্র পরবর্তী মুহূর্তেই সম্পূর্ণ হল। তবু, তারই মধ্যে কেবল, 'আমার' শব্দটিকে নাম হিসেবে ব্যবহার করে, এবং কবিতা কথাটি প্রথম লাইনে রেখে—ব্যক্তিগত এই কবিতাকে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন এই কবি।

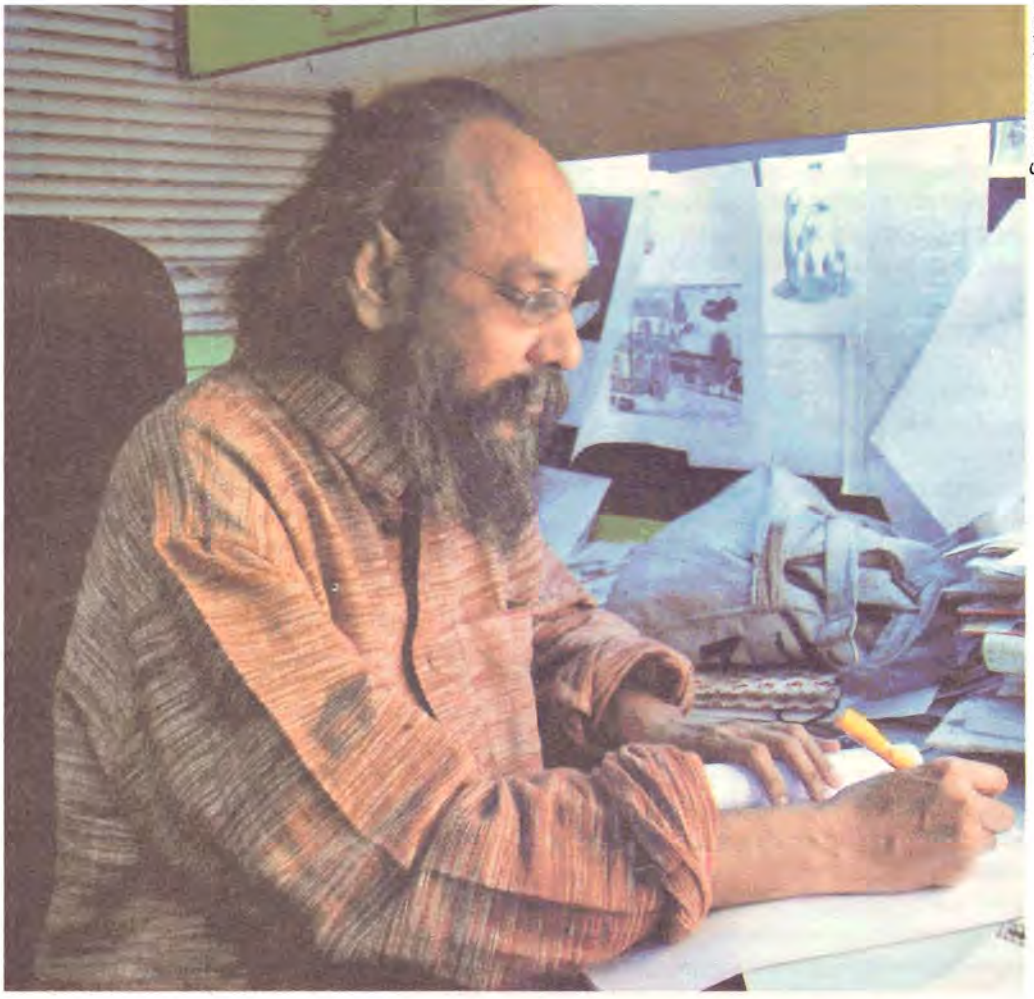

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট কবিতায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধি বিস্ময়কর। একেকটি বিশেষ সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি ছোট্ট ছোট্ট কবিতার মধ্যে ধরেছেন সেই সময়ের অগ্নিপিণ্ডকে। যেমন, এই লেখা

জেলখানার কবিতা

একজন কিশোর ছিল একেবারে একা
আরও একজন ক্রমে বন্ধু হল তার
দুয়ে মিলে একদিন গেল কারাগারে
গিয়ে দ্যাখে তারাই তো কয়েক হাজার।

যে বইতে এই কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম 'ওরা যতই চক্ষু রাঙায়'। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ষোলো। দাম তিরিশ পয়সা। নরম মলাট। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। সমস্ত বাংলায় তখন জেগে উঠছে তরুণদের হাতে হাতে নকশাল বাড়ির আগুন। জেলে যাচ্ছে অজস্র কিশোর-তরুণ।

এই বইয়ের ভূমিকা থেকে দু'টি লাইন বলি

'এই পুস্তিকায় প্রকাশিত একটি মাত্র কবিতা
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি অবস্থায় লেখা।
ওই কবিতাটির প্রকাশকাল ৫ জানুয়ারি ১৯৬৮।...'

এই অসামান্য কবিতাটির পাশে আরও একটি তুলনায় কম পরিচিত কবিতা রাখা যায়

সমস্ত রাত বুকফাটা চিৎকার
সমস্ত রাত মাইকে হিন্দি রেকর্ড
সমস্ত রাত রাংতায় মোড়া খড়্গ
নিজেকে ব্যঙ্গ করে।

কবিতাটির ১ নভেম্বর ১৯৬৭-তে লেখা। ১ নভেম্বর বলতে অনুমান হয় যে, কাছাকাছি সময়ে কালীপুজো। সমস্ত দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিতে চলেছে তারুণ্য। অন্য আরেকরকম যুবসমাজ রাতভর মাইক বাজিয়ে কালীপুজোর উৎসব নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে মূর্তির হাতে খেলনা খড়্গ রাংতায় ঢাকা। ওই অন্য আরেকরকম যুবকসমাজ যেমন রাংতার মতো সস্তা চকচকে আমোদে ব্যস্ত। দূরে কোথাও তখন শপথ নিচ্ছে কারা। তৎকালীন সমাজস্রোতের ওঠাপড়া মনে রাখলে এই কবিতা একটি

ইতিহাসকে নিজের মধ্যে টেনে আনছে, বোঝা যায়।

পরের যে কবিতাটির কথা বলব, সেটি আছে এই কবিরই 'পৃথিবী ঘুরছে' নামক বইতে। সেই বইও ষোলো পৃষ্ঠার বেশি নয়। দাম এক টাকা। নরম কাগজের মলাট। সেই বইয়ের প্রথমে, শিরোনামহীনভাবে মুদ্রিত ছিল এই চার লাইনের কবিতা

চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিলেন, 'পৃথিবী ঘুরছে না।'
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও
যতই তাকে চোখ রাঙাও না।

একথা এখন সকলেরই জানা যে, বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তাতে চার্চ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এই মতবাদ প্রত্যাহার করতে চাপ দেয়। অত্যাচারের ভয় দেখায়। ব্রেশটের 'গ্যালিলিও গালিলেই' নাটকে গ্যালিলিওর মুখে এই স্বীকারোক্তি আছে : 'ওরা যে আমাকে অত্যাচারের যন্ত্রগুলো দেখাল। এই বয়সে আমি আর শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে পারব না।'

তাই ভীত কোণঠাসা গ্যালিলিও প্রকাশ্যে তাঁর মত প্রত্যাহার করে নেন। বলেন, চার্চই ঠিক। তিনি ভুল। যদিও গোপনে গোপনে তিনি নিজের আসল মতবাদটি প্রমাণ সহ 'ডিসকোর্সি' নামক একটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে রেখে যান, যা তিনি তাঁর ছাত্র আন্দ্রেয়ার হাতে দিয়ে যেতে পারেন। এখানে বলা বাহুল্য হবে না যে, গ্যালিলিওর এই মত স্বীকার করে নিতে চার্চের ৩৮৮ বছর সময় লেগেছিল। এই সেদিন মাত্র, ১৯৯৮ সালে, চার্চ একথা মেনে নেয়। তবু পৃথিবী তো ঘুরেছেই, তাই না? বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই 'পৃথিবী ঘুরছে' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ৭ নভেম্বর ১৯৭৫। মনে রাখতে হবে, তার আগে সে বছর ২৫ জুন মধ্য রাত্রে সারা দেশে ঘোষিত হয়ে গিয়েছেন জরুরি অবস্থা তারই পরিপ্রেক্ষিতে যদি দেখি, তবে ছোট্ট এই চার লাইনের লেখার শক্তি বোঝা যায়। ১৯৭৭ সালে যখন ছোট্ট এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন ভূমিকায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'কবি সরোজ দত্ত ও আশু মজুমদারকে উৎসর্গ করে নিহত কবিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, এবং যে পুলিশি সন্ত্রাসের তাঁরা বলি হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার জানাচ্ছি।'

গ্যালিলিওকে বন্দি করে, তাঁর মত প্রত্যাহার করিয়ে যেমন পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ আটকানো যায় না, তেমনই বিদ্রোহীকে গুলি করে খুন করলেও তার মতবাদকে খুন করা যায় না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সমকালে দেখা দিত। তা হল, তাঁর কবিতা অনেক সময়ই স্লোগানধর্মী।

মানুষের উপর শাসকের অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা কথা বলেছে বলে কখনও তাকে প্রত্যক্ষ হতে হয়েছে। এই প্রত্যক্ষতা হল অত্যাচারীর মুখোমুখি মাথা তুলে দাঁড়ানো। কিন্তু তাঁর কবিতায়, বিশেষত ছোট্ট কবিতাগুলোতে বোঝা যায়, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযম ও সংকেত, দুই-ই তাঁর অধিকারে ছিল। যেমন এই কবিতা—

জাতক

পেটের আগুন খিদে
হাঁটতে শিখেছে
গলার রক্ত খিদে
পৃথিবী দেখছে

হাত দুটি তার খিদে
কেবল বলে দে।
পা দুটি তার খিদে
পৃথিবী গিলছে।

কবিতাটি শুরু হল, নবজাতক হাঁটতে শিখছে। কান্নাচেরা গলা। তাই গলার রক্ত ওই চিৎকার। কারণ কী? খিদে। চারপাশ নতুন ও ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে। কবিতাটির গতির সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে যেন বড় হচ্ছে শিশু। হাতদু'টো বাড়িয়ে বলছে : দে? বাড়ানো হাত দু'টিই যেন খিদে। শেষ দু'টি লাইনে এসে পড়ল পুরাণের সেই বামন অবতারের ধারণা। ক্ষুদ্র বামন পা ফেলছে। এবার সে পা রাখবে কোথায়। এক মুহূর্তে সেই নবজাতক যেন অতিকায় দানবে রূপান্তরিত। তার পায়ের তলায় সারা পৃথিবী ঢেকে গেল। এবার সেই ক্ষুধা পৃথিবী গ্রাস করছে। এই সময়ে চকিতে শিশু কৃষ্ণের মুখের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড—এই কল্পনাও উঁকি দিয়ে যায়। আবার সহস্র ক্ষুধার্ত মানুষের পদক্ষেপ একদিন সমস্ত পৃথিবী অধিকার করে নেবে—এই সংকেতও পাওয়া যায়। কবিতাটি শেষ লাইনে এসে যেন বিস্ফোরিত হয়। একরত্তি ভিখারি শিশুকে নিয়ে অবিস্মরণীয় কিছু কবিতা রয়েছে এই কবির এটি তেমনই একটি লেখা। এই ছোট্ট কবিতাটির গঠনের মধ্যে একদিকে রয়েছে সহজ লোকায়ত ছড়া ও লোকগানের মর্ম। গানের চরিত্র থেকে পাওয়া ধ্রুবপদের মতো 'খিদে' চিহ্নিত লাইনগুলো প্রায় স্লোগানের মতো ব্যবহৃত। চার লাইনের দু'টি স্তবকে কবিতাটি সম্পূর্ণ। কবিতাটি চলেছে মূলত দু'লাইনের একক অবলম্বন করে। দু'টি করে একক নিয়ে একটি স্তবক। প্রতি দু'লাইনের প্রথমটি আসছে খিদে শব্দটিকে লাইনের প্রান্তে নিয়ে। স্লোগানে যেমন একটি লাইন বারবার ব্যবহার হয়, দ্বিতীয় লাইনটি হয় কিছুটা আলাদা বা নতুন। তাই স্লোগানের উত্তেজনা বাড়ে। এই কবিতাটিতে গতির ক্রমবৃদ্ধি ও চূড়াস্পর্শ ঘটেছে। কত সূক্ষ্ম এই কারুকৃতি, অথচ কতটাই লুকনো। কত স্বাভাবিক এর চলন। অর্থাৎ, স্লোগানের ফর্মটিকেও লুকিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লোকগান যেমন আমরা শুনি, মুখে মুখে বলা ছড়াও তো শুনি কত। এই কবি নিশ্চয়ই শুনেছেন। আবার রাস্তায়, মিছিলে স্লোগানও আমাদের কানে এসে বাজে। এইসব আসে অত্যন্ত স্বাভাবিক গতির মধ্য দিয়ে। তাই, তেমনই স্বাভাবিকতা রেখে, এইসব কিছুর মধ্যে থেকে কবি তুলে নিয়েছেন তাঁর কবিতার গঠন। যে গঠন তাঁর বিষয়ের সঙ্গে সহজভাবে মিলেমিশে থাকে। যেমন এই কবি চেয়েছিলেন বৈষম্যহীন পৃথিবীতে মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজে মিলে মিশে থাকুক, তেমনই।

বা

বাংলার
মুখ

পথের পাঁচালি

কেমন হয়, যদি, চলতি অভিবাদনের রোজনামচা আওড়াবার বদলে গাছের নামে শপথ কাটি? মণিহারি দোকানের আলটুস্কি উপহার থেকে ফুল, ফুলেরও একধাপ উপরে গিয়ে যদি ভালবেসে গাছ দিই একে অপরকে? বেশ গাছে গাছে ভরে উঠবে চারিপাশ! আজ-কালের মধ্যে না হলেও, আগামী প্রজন্ম তো সবুজ দেখবে।

জয়া মিত্র

সাঁওতালি ভাষায় কথা বলাকে বলে গালমারাও। বক্তৃতার ব্যাখ্যা হিসেবে এরকম উপযুক্ত শব্দ আর হয় না। ঈষৎ অর্থ বদল করে গালবাদ্যও বলতে পারি হয়তো। বক্তার গণ্ড-পরিশ্রমের মারে যাদের মারা পড়ার জোগাড় হয়, তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন। তো সেইসব গালমারাও সভার কল্যাণে ঘরে বেশ কিছু ফুল জড়ো হয়েছিল, ফুলের মতো সুন্দর জিনিসও বাসি হয়, আবর্জনা হয়ে যায়, বড় দুঃখ হয়। আর এ বাসি তো বৈষ্ণবের কুঞ্জভঙ্গের বাসি বকুলের মালা নয়, কত যত্নে ফুটে ওঠা, কতো সমাদরে দেওয়া, রাত ফুরোবারও আগেই শেষ। পলিথিন কী সেলোফেন মোড়া মৃত ফুল মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয়, আদর করে এক আধবার গাছের ছোট্ট চারা কি দেওয়া যায় না অতিথিদের? না না, মেহগনি কিংবা অশোকের নয়, শহরে জায়গা নেই গাছের জন্য, কিন্তু অন্তত তুলসী কী জুঁই, বেল বা যে গাছরা টবেও বাঁচে? ঘর-বারান্দার কোণে কোথাও একটু সবুজ ধরে রাখবে স্থায়ী শুভেচ্ছাপত্রের মতো। নিত্যদিন মনে করিয়ে দেবে। বছর পাঁচেক আগে উত্তরবাংলার এক মহিলাদের সংস্থা ছোট্ট ঝাঁপির মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিলেন একটি ফার্নের চারা। আসানসোলের ব্রহ্মরোদে প্রথম বছরটা তাকে ছায়ায় রাখার বৃথা চেষ্টা করতাম আর ভাল ভাল কথা বলে ভোলাতাম, দ্যাখ তুই তো জানি পাহাড়ের গায়ে ঠান্ডা ঠান্ডায় থাকিস। এখানে যা রোদ, খুব কষ্ট হচ্ছে তোর, তা-ও তো সত্যি! কিন্তু কতদূর থেকে একটা বন্ধুর বাড়িতে এসে যদি মরে যাস সেটা কত খারাপ, ভেবে দ্যাখ—এই সব সাতসতেরো। কীসে যে সে কনভিন্সড হল, বলা শক্ত, কিন্তু এখন চারখানা টব ভর্তি করে তার উপছানো সংসার। যখনই চোখ পড়ে, মন ভাল হয়ে যায়।

উপহার হিসাবে গাছ যে খুব খু-ব সুন্দর, সে কথা বরাবরই মনে হত, কিন্তু বলা যেত না, পাছে লোকে হ্যাংলা বলে। কিন্তু উড়িষ্যার একটা জায়গা ঘুরে এসে ভরসা বেড়েছে।

নাম নয়াগড়। ভুবনেশ্বর থেকে গাড়িতে ঘণ্টা পাঁচেক দূরে নয়াগড় যখন পৌঁছলাম, সূর্য মাঝ আকাশে। কিন্তু সেরকম ভয়ানক গরম লাগছিল না। মাথার ওপর বড়বড় গাছের চাঁদোয়া রোদ ঢেকে ঝিরিঝিরি ছায়া দোলাচ্ছিল আর রাস্তার ধারের বিরাট পুকুর থেকে উঠছিল আলতো জলছোঁয়া হাওয়া। বৃক্ষবন্ধু মহাসঙঘ আশ্রমের দরজায় কয়েকটি স্কুলের ছেলেমেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক গোপীনাথবাবু সমস্বরে সেই কাঁচারা বলে ওঠে 'বৃক্ষ বিনা জীবন নাহি' বহিরাগতরা ঈষৎ থতমত। এরকম সম্ভাষণ স্যালুটেশান তো শোনা যায়নি কোনওদিন।

সন্ধ্যাবেলা আশ্রমের বড় ঘরে বসে শুনেছিলাম সেই অভিবাদনের উপাখ্যান। ছোটছোট টিলা পাহাড়ে ভরা নয়াগড় একসময়ে ছিল বেশ সমৃদ্ধ জেলা। তারপর সাতের দশকে পরপর তিনবার অনাবৃষ্টি। খেত-পুকুর শুকিয়ে গেল। পেট চালাতে পাহাড় থেকে গাছ কেটে বেচে দিতে লাগল এইসব গ্রামের লোক শেষে এমন দশা হল যে, বৃষ্টির পরও ক্ষেতে হাল দিতে চায় না জোয়ান লোকেরা। কাঠ কেটে বেচে দিলে হাতে হাতে নগদ টাকা জুটে যায়। কিন্তু সেই নগদ টাকার পিছু পিছু একদিকে জঙ্গল উধাও হতে লাগল আর অন্যদিকে গাছের শিকড়হারা আলগা মাটি-পাথর বৃষ্টির তোড়ে পাহাড় থেকে নেমে এল নীচে ভরে ফেলল চাষের ক্ষেত, গ্রামের পুরনো কালের বিশাল সব পুকুর বেচে খাওয়া আলগা টাকার পিছু পিছু আরও যা আসে, সেসবও এসে ঢুকল গৃহস্থ ঘরে, মদ জুয়া মারধর বচ্চকি, নিত্য অশান্তি। গাছ কাটতে কাটতে এক সময়ে এমন হল যে, পাহাড় একেবারে বৃক্ষশূন্য। হাঁড়িতে ভাত ফোটাবার শুকনো ডালপাতাটুকুও জোগাড় করা কঠিন হয়ে উঠেছিল এই দমবন্ধ কালো জায়গাটা থেকে কী করে বাঁচা যাবে—মানুষেরা, সুস্থ মানুষরা ব্যাকুলভাবে সেই কথা ভাবছিলেন তাঁদেরই মধ্য থেকে বেরিয়ে এল পথ, স্থানীয় শিক্ষক গোপীনাথবাবুর হাত ধরে।

সত্তরের সময়ে গান্ধীবাদী এই তরুণ নিজের অঞ্চলের গ্রামের অবস্থা একটু ভাল করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তাঁর মনে হয় গাছ লাগানো গাছের যত্ন করা এমন একটা কাজ, যা বাইরের পরিবেশকে পালটে দেয়, একইসঙ্গে মানুষকে বদলে দেয় ভেতর থেকে কোমলতার দিকে, প্রাণকে যত্ন করার দিকে, সৌন্দর্যকে নিঃস্বার্থ ভালবাসার দিকে মানুষকে এগিয়ে দিতে পারে গাছ গ্রামের প্রবীণদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। মেয়েদের সঙ্গে, যুবকদের সঙ্গে, শিশুদের সঙ্গে। গ্রামসভায় সকলে মিলে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন—একটি গাছও কেউ কাটবে না, যতদিন না নতুন গাছ বড় হয়ে ওঠে। দেশি গাছের চারা লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে খুব সাহসী এক সিদ্ধান্ত নিলেন তিন-চারটি গ্রামের মানুষ একমাস সময় নিয়ে গ্রামের সমস্ত ছাগল বিক্রি করে দিলেন তারা বড় গাছ নষ্ট করে ছাগল। বদলে অন্য কাজ জোটালেন হাত দিলেন পুকুর সংস্কার করা, ক্ষেতের জমি পাথরমুক্ত করার কাজে। পরের বছর বর্ষায় চাষ শুরু হল আবার বর্ষার শেষে পাহাড়ে নতুন লাগানো গাছের পাশাপাশি মাটির তলা থেকে জেগে উঠল ফুরিয়ে যাওয়া স্থানীয় গাছেরা। গ্রামে গ্রামে বাচ্চাবুড়োর মুখে মুখে তৈরি হল নতুন অভিবাদন—'রাম রাম' 'আসসালাম আলেইকুম'

'জয়গুরু'র জায়গায় এই 'বৃক্ষ বিনা জীবন নাহি'। বড় দারিদ্রে কষ্টে অর্জিত শিক্ষাকে আর না ভোলার এই অভ্যাস। যে কোনও অনুষ্ঠানে, বিয়ে শ্রাদ্ধ উপনয়ন ভাল রেজাল্ট—সর্বত্র উপহার হিসেবে গাছের জায়গা হল সর্বাগ্রে বাধা আসেনি, এমন নয়। রাতারাতি তিনশো গাছের চারা উপড়ে তুলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। কেউ শাস্তি দেয়নি তাকে। পুলিশে দেয়নি। কেবল তার উঠোনে শান্ত, বসে থেকেছেন শোকার্ত গ্রামবৃদ্ধেরা। বনদফতরের পারমিট নিয়ে কাঠ কাটতে আসা ট্রাক ঘিরে শুয়ে থেকেছেন মেয়েরা। পুরুষরাও।

একবছর দু'বছর নয়, প্রায় ত্রিশ বছর লেগেছে, কিন্তু ছ'শোর বেশি গ্রাম নিয়ে আজ এই মহাসঙ্ঘ। ষাট-বাষট্টিটি প্রকাণ্ড দিঘি। তিনশো হেক্টর জমিতে ওষধি অরণ্য। আসন্ন গ্রীষ্মে সবুজ ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাহাড় বুনো করমচা ফুলের সাদা সাদা নক্ষত্রে সাজানো। অসংখ্য পাখির বকবকানি। আম মঞ্জরীর প্রগাঢ় সুবাস। শান্তি। সহজ শান্তি। মানুষের ঘামের চেয়ে মজবুত কোনও সিমেন্ট নেই, কে যেন বলেছিলেন। মানুষের হাতে তৈরি সৃষ্টির চেয়ে সুন্দরই বা কী! রোজ দেখি, অবহেলার ধুলো জমে মনের ওপর। আর দেখতে পাই না নিজের আশপাশের নিত্য সুন্দরের উপহারগুলোকে। সহজ সুখের সুধা—।

একটা ঘটনা মনে পড়ল। সাড়ে চার বছর পর জেলখানার বাইরের রাস্তাঘাট দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি লোকজনের সহজ স্বাভাবিক কথার আওয়াজ। মায়ের সঙ্গে রাত্রের গাড়িতে যাচ্ছি পুরুলিয়া। আদ্রা স্টেশনে মা বলে, 'চা খাবে?' খাবার পর মাটির ভাঁড়টা ব্যাগে রাখতে যাচ্ছিলাম। মা বলে 'তুলছ কেন? ফেলে দাও।'

ফেলে দেব? এত সুন্দর জিনিসটাকে! দীর্ঘকালের অদর্শনই হয়তো সেই মানুষের হাতে করে তৈরি ওই মাটির খুরির সত্যকারের মূল্য, তার দুর্লভ সৌন্দর্য দেখতে দিয়েছিল।

আজ যা কিছু বড় অনাদরে, জেলায় অগ্রাহ্য করছি, তার স্বরূপ দেখবার জন্য কোনও অন্তরালের প্রয়োজন হবে? কত মূল্য দিয়ে তাকে দেখব? একটি শাখার নতোন্নত ভঙ্গি, পাখির একটি শিস, মাটির ঢেলার স্নিগ্ধ রং? বহে যাওয়া জলের কলকল ধ্বনি?

রো
রোববারের
রামপ্রসাদী

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

উনচল্লিশ

জ্বলন্ত চিতার খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আমি আর সুবল এইমাত্র চিলুতে চড়ানো শবের সৎকার কাণ্ড প্রত্যক্ষ করি। অবিশ্যি এটা আমার কাছে নতুন নয়। ঘুরে ফিরে একলা একলা এই শ্মশানে যে কতবার আসি, তার হিসেব নেই। কেন জানি না, এখানটিতে আসতে আমার খুব ভাল লাগে।

এই ভাল লাগার ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি রক্তগত বিষয় আছে। কানুবাবা বলে সে নাকি বাল্যকাল থেকে শ্মশান চাটা। আসলে, বাবার জীবনটা তো জন্মকাল থেকেই অদ্ভুত! স্কুল মাস্টার আর সাধুসন্ত নিয়ে মশগুল তাঁর পিতা একে পত্নীহারা, তার ওপর সর্বদাই বাইরে বাইরে মন। সংসার চলছে মাতৃদেব্যা, গৌর শিরোমণি ইত্যাদিদের দৌলতে। বাড়ি তো নয়, হাট। কানুবাবা, একে স্কুলের পড়া পড়তে বসলে বইয়ের পৃষ্ঠায় ফুটবল লাফায়, দ্বিতীয়ে প্রায় গার্জেনহীন। ফলে, বেশিরভাগ সময়ই পথে পথে কাটে। বাপ-ছেলের কদাচিৎ দেখা হয়। তা ছাড়া, দু'জনে দু'জনকে কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন।

এমন ছন্ন জীবনধারী বাবা ছেলেকাল থেকে শরৎবাবুর ভক্ত। 'শ্রীকান্ত' থেকে পছন্দ মতো টুকে টুকে ছোট ডায়ারি ভর্তি করে রাখে। এক এক রাতে কাঁচরাপাড়ার বাবুব্লক কোয়ার্টারে এমনই জনসমাগম যে, বাবার বাড়িতে শোয়ার জায়গা হয় না। ফলে বেশিরভাগই অন্যের বারান্দায় বা রোয়াকে খবরের কাগজ পেতে নিদ্রা। শীতকালে কম্বল মুড়ি। আর সারাদিন চড়েবরে শোওয়া মাত্র তেড়ে ঘুম। রাতে গায়ের ওপর দিয়ে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও ঘুম টোটে না।

কানুবাবার বিচিত্র জনা কয় বন্ধু জানে, কোথায় কখন তাকে পাওয়া যায়। ফলে, রাত বিরেতে কেউ অসুস্থ হলে অথবা মারা গেলে—ডাক কানুকে। তখনকার শর্টকাট পথ, কাঁচরাপাড়া থেকে ডাঙাপাড়ার ভেতর দিয়ে হালিসহর শ্মশান ঘাট। সেকেন্ড ওয়ারের দরুণ বানানো কংক্রিটের টানা রাস্তা। দু'ধারে ঘর-বাড়ি নেই। নিবিড় জঙ্গল। ডোবা, পুকুর, বাঁশঝাড়। দিনমানেও খাঁ খাঁ নিঝ্‌ঝুম। এমন ঘোরতর পরিবেশপত্র সত্ত্বেও, এত মড়া কাঁধে বওয়ার পরেও, কানুবাবা কোনওদিন ভূত দর্শন করেনি। ভূতও নাকি তাকে ভয় পায়।

তা এমনি এক রাত্রিকালে, কলেরায় মরা এক কিশোরীর দেহ নিয়ে বাবুব্লক থেকে সিধে হালিসহর শ্মশানে বাবা, সঙ্গে আর তিনজন বন্ধু। কলেরা বলে লোক পাওয়া যায়নি। সে ছিল শীতের মাঝরাত। তা, শ্মশানে বডি এনে রেখে তিনজন ওপরে উঠে গেল কাঠ আনতে। কানু রইল মড়া পাহারায়। তখনকার এই শ্মশান অতি ভয়সঙ্কুল। চারধারে ঠাসা জঙ্গল। বাবলা, গাব, বেল আর কন্টিকারির জাঙাল। রাতের বেলা এই ঠান্ডায় স্থানটি মৃত্যুর বড়ো কাছাকাছি। কানু মড়া আগলে বসে আছে বাঁশের চালির একটি ভগ্ন কঠিন ঠান্ডার মাঝখানে ছানাকাটা চাঁদনি গঙ্গার টুকটাক মেছো নৌকোয় লণ্ঠন মিট মিট। ওধারে শিশু পুঁতে দেওয়া ঝুপসি এলাকায় গাব গাছের আড়ালে বসে শকুন কাঁদছে বিকট। কেঁদো কেঁদো শ্মশান কুকুরগণ ধমকাচ্ছে সেই ছিঁচকাঁদুনেদের। কানু গঙ্গার দিকে অন্যমনা চেয়ে চেয়ে উদাস গান ধরেছে, পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ—

তখনই, ঠিক তখনই, মৃতদেহ রাখা বাঁশের চালিখানায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। এমনই প্রবল সেই হ্যাঁচকানি যে, কানু বাঁশের ভগ্ন থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে আর কী। মুহূর্তে মনের মধ্যে ভয় কী হল, কী হল হঠাৎ! শীতের ঠান্ডার সঙ্গে উদ্বেগের হিম এসে ঘা দেয় বুকের ভেতরে। আরও একবার হ্যাঁচকানির সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘোরায় দ্রুত কানু। দেখে সেই কলেরায় গত ছেলেমানুষ মেয়েটির হাঁটুর কাছে কামড়ে ধরেছে একজন ডাকাবুকো শ্মশান কুকুর। দাঁত বসিয়ে ঠান্ডা দেহে ঝাঁকুনি দিচ্ছে প্রাণপণ। কানু তড়াক উঠে দাঁড়ানো মাত্র সে ওখান থেকে এক কামড় মাংস নিয়ে দৌড়। কানু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ফুটবলি দম ধরে ধাওয়া করে তাকে। হাতে পড়ে থাকা একখণ্ড কাঁচা বাঁশ। ওপরে ওঠা সিঁড়ির মুখে কুকুরটি হাল ছাড়ে পিঠে বাঁশ পড়ার ধাক্কায়। দন্তে কামড়ানো নরমাংস খণ্ডটি ফেলে সে পালিয়ে বাঁচে। কানু হেঁট হয়ে দেহচ্যুত মাংসখণ্ডটি তুলে নিয়ে দৌড়ে, সেন্টার লাইন বরাবর ফিরে যায়। তারপর সেই খণ্ডটি হাতে করে থাবড়ে থুবড়ে কোনওপ্রকারে সেঁটে দেয় মৃতদেহের যথাস্থানে।

কিন্তু আমার চোখের সামনে এ কী কাণ্ড! এমন তো কখনও ঘটেনি। জ্বলন্ত চিতার মাঝখানে হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে উঠে বসেন সেই শীর্ণকায়, উল্টো মুখে। সুবল আমার হাত চেপে ধরে। অমনি দু'জন লোক দৌড়ে যায় ওধারে

কী হল, কী হল রবে। শান্ত, সুশীল ফিঙে কাকা কোনও কথা না বলে পড়ে থাকা একখণ্ড বাঁশ তুলে নিয়ে উঠে বসা মৃতের গায়ে পরপর বাড়ি মারতে থাকেন। একসময় ঢেউ থমকায়। সাপের ফণা গোটানোর ধাঁচে দেহটা আস্তে আস্তে যথাপূর্বং হয়ে যায়। ফিঙে কাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত থেকে বাঁশখানা ফেলে দেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে ওঠেন, নার্ভে টান পড়েছিল যে।

তবে, আমার পিতামহ শিশিরকুমার বিয়ের কিছুকাল পরেই ভাটপাড়ার ভাড়া বাড়িতে একদিন প্রেত টের পেয়েছিলেন। সেই বাড়িটা ছিল মস্ত।
একতলা—অনেকগুলো ঘরওয়ালা। জনশ্রুতি, ও বাড়িতে নাকি ভূত বর্তমান। শিশির মাস্টার ও সব বিশ্বাস করতেন না। আমার বড়মা—যার নাকি ভূত দেখার রাশ আছে, ও বাড়িতে অপরিচিত লোকজন দেখেছে. তারা হঠাৎ এল আবার হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। এ ঘটনা ভর দুপুরেও। বড়মা উঠে গিয়ে দেখে বাইরের সব দোর যথারীতি বন্ধ। ইস্কুল ফেরত দাদুকে সব কাণ্ড বলতে, ছেলে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, আরে মা, এ বাড়িতে তুমি-আমি এত ঠাকুরের নাম করি, ওসব থাকলেও ধারেকাছে ঘেঁষবে না। আর একদিন দুপুরে কোথা থেকে এক দাড়িওয়ালা বুড়ো বড়মাকে ঘুম থেকে তুলে. বড় তেষ্টা পেয়েছে। বড়মা উঠে জালা থেকে ঘটিতে করে জল আর রেকাবিতে একটু এখোগুড় এনে দেখে বুড়ো হাওয়া। ওধারে দুয়ারে দুয়ারে দিব্যি ভেতর থেকে কুলুপ আঁটা।

শিশিরকুমারের কাছে এমনই বহু ঘটনা দাখিল হয়। তিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। একদিন গরমদিনের মাঝরাতে তাঁর গোসলে যাওয়ার দরকার পড়ল। ধর্ম পত্নী তখন ক'দিনের জন্যে ওপাড়ায় বাপের বাড়ি গিয়েছেন। ওঠার সামান্য শব্দে বড়মার ঘুম ভেঙে গেল।

—কী হল বাপ?

—কিছু না। একটু বাইরে যাব মা

—দাঁড়া, হারিকেনটা উসকে দি

এই বলে বড়মা লণ্ঠনটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে ছেলের পেছু পেছু বারান্দায় এল। ছেলে বুঝল, মা কেন উঠে এল। মুখে কিছু না বলে মস্ত উঠোনের কোণে পরপর অনেকগুলো সিঁড়িধারী উঁচু পায়খানার দিকে এগোতে এগোতে দেখল, মা ঠোঁটে দোক্তা টিপছে বারান্দায় উবু হয়ে বসে। শিশিরকুমারের হঠাৎ কী মনে হল, এই নিশীথ রাতের মাঝখানে উঁচু সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে। মনে মনে বলা হল, ঠিক আছে, সত্যি যদি কেউ থাকো এ বাড়িতে, আমি যখন গোসল করে বেরব তখন আমায় ওপর থেকে ধাক্কা দিও দিকি।

বড়মা লণ্ঠন জ্বেলে বারান্দায় ছেলে পাহারা দিচ্ছে। হাই তুলছে শব্দ করে। খাঁ খাঁ উঠোন। পাঁচিলের এপার ওপার ঝিরকুটে অন্ধকার। রাস্তায় দাগি ষাঁড় ঘুরছে আর ভোঁস ভোঁস নিশ্বাস ছাড়ছে। পাড়াচড়া কুকুরগণ থাকে থাকে দাঁত খিঁচুনি দিচ্ছে। রাস্তার ওপার থেকে গঙ্গার বাতাস ঘুরতে ঘুরতে পাঁচিলপারের অন্ধকারে এসে লাট খাচ্ছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে। মা লণ্ঠনপারে বসে ছেলের মনে ভরসা জোগাচ্ছে আর হাই তুলছে। জল শৌচ অন্তে ছেলে গাড়ু হস্তে সিঁড়ির টঙে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বলে উঠল, যদি কেউ সত্যি সত্যিই থেকে থাকো এ বাড়িতে, আমায় দাও দিকিনি পেছন থেকে একটি ধাক্কা। কথাক'টি মনে মনে বলতে যতক্ষণ। পেছন থেকে বলবান এক হাওয়ার হাতে মোক্ষম একটি ঠেলা পড়ল। ছেলে খানিক উচ্চ শূন্যে উঠে দড়াম করে উঠোনের মধ্যিখানে পপাত হল। এবং হওয়া মাত্র চিৎকার করে বলে উঠল, আছ বাবা আছ। আছ বাবা, আছো হে এ এ এ। হাই আটকে বড়মা চমকে বলে, কী হল রে? কী হল বাপ? ছেলে মাজায় হাত বুলোতে বুলোতে শুধু বলল, একটা হাওয়া।

দু'দিন পরেই জগদ্দল বাজারের এক ওঝাকে খবর করিয়ে ডেকে আনা হল। সে এসে বাড়ির সবক'টি কোণের মাটি তুলে তুলে শুঁকে দেখলে। তারপর প্রকাণ্ড একটি মালসায় ঘুঁটের আগুন করে তাতে মুঠো মুঠো ধুনো নিক্ষেপ করতে লাগল ওঝা। অমনি কী কান্ড। কোথায় ধুনোর সুবাস। তার বদলে উৎকট মড়াপোড়া গন্ধ দাপিয়ে উঠল বাড়িময়। সেই চামড়া পোড়া দুর্গন্ধে সবার নাকে কাপড়। ওঝা বলল, এ বাড়িখানা একটি প্রাচীন গোরস্তানের ওপর দাঁড়িয়ে। এখানে যাঁরা এখন বর্তমান রয়েছেন, তেনারা সবাই কাঁচাখেগো মামদো। ওঁয়ারা আবার কচি নারী মাস পছন্দ করেন।

আমার কণা ঠাকুরমার তখন ঘুসঘুসে জ্বরের বনেদ সবে ধরেছে। এদিকে উদরে তিলে তিলে বাড়ছেন আমার কানুবাবা। আর কচি কণার কোমরে ভিত গেড়ে বসছে বোন টিবি। আমার সরলমতি, বই উন্মাদ, ইস্কুল মাস্টার যুবক পিতামহর ভবিতব্যে কী এক ঝোড়ো হাওয়ার ভবিতব্য লেখা হচ্ছে। রচিত হচ্ছে কানুবাবার চড়ে বেড়ানো আর বিচিত্র অভিমানী অন্তঃকরণ ও তার পাণ্ডুলিপি।

শ্মশানে দাঁড়িয়ে ভর দুপুরের মাঝখানে এমনি এমনি ওই মড়া পোড়ানো দেখতে দেখতে চোখ যায় অগুণতিবার দেখা শ্মশানের মুড়ি কোঠা কিংবা চিলু কামড়ানো দেওয়ালে দা দিয়ে কেটে কেটে লিখে রাখা, বাপ্পা, চিন্তামণি, সুধীর দাস, আলপনা, তৃপ্তি...।

মানুষগুলো এই এখানে কবে কে জানে পুড়ে ছাইভস্ম হয়েছে। কিন্তু তাদের নামগুলো দিব্যু জেগে আছে, একজনের ঘাড়ে আর একজনা। তাও কোনও ঝগড়া বিবাদ নেই। দাঙ্গা নেই। দেশভাগ নেই। কুর্সি টানাটানি নেই।

ঠিক এইখানটিতে আমার মনে একটি তত্ত্ব হুহু করে ওঠে গঙ্গার বাতাসে ছেঁড়া কোটা চিতার আগুন লকলকে শিখা হয়ে। কথাগুলো আমার পিতামহর। মানুষের দেহটা আসলে খোল। ভেতরে যে থাকে, তার নাম আত্মা। দেহ মরলেও সে মরে না। দেহ ফেলে রেখে আত্মাটি বাইরে বেরিয়ে পড়ে ছেঁড়া কাপড়ের মতো খোল ত্যাগ করে। সে সময় সেই আত্মাটিকে কেউ দেখতে না পেলেও সে সবাইকে দেখে। তার তখন একটি আকার ছাড়া আকার হয়। তার উচ্চতা আর আড়া ঠিক হাতের বুড়ো আঙুলবৎ।

প্রসাদ হাসিমুখে ঘন ঘন মাথা আন্দোলিত করতে করতে বলে ওঠেন, কিন্তু তুমি এ কর্মটি করে প্রস্থান কল্লে তো হবে না।

—কী? কী কর্ম ভায়া?

—ওই যে, কর্দোরফ্থ—মানে, কে এ কর্মটি করে

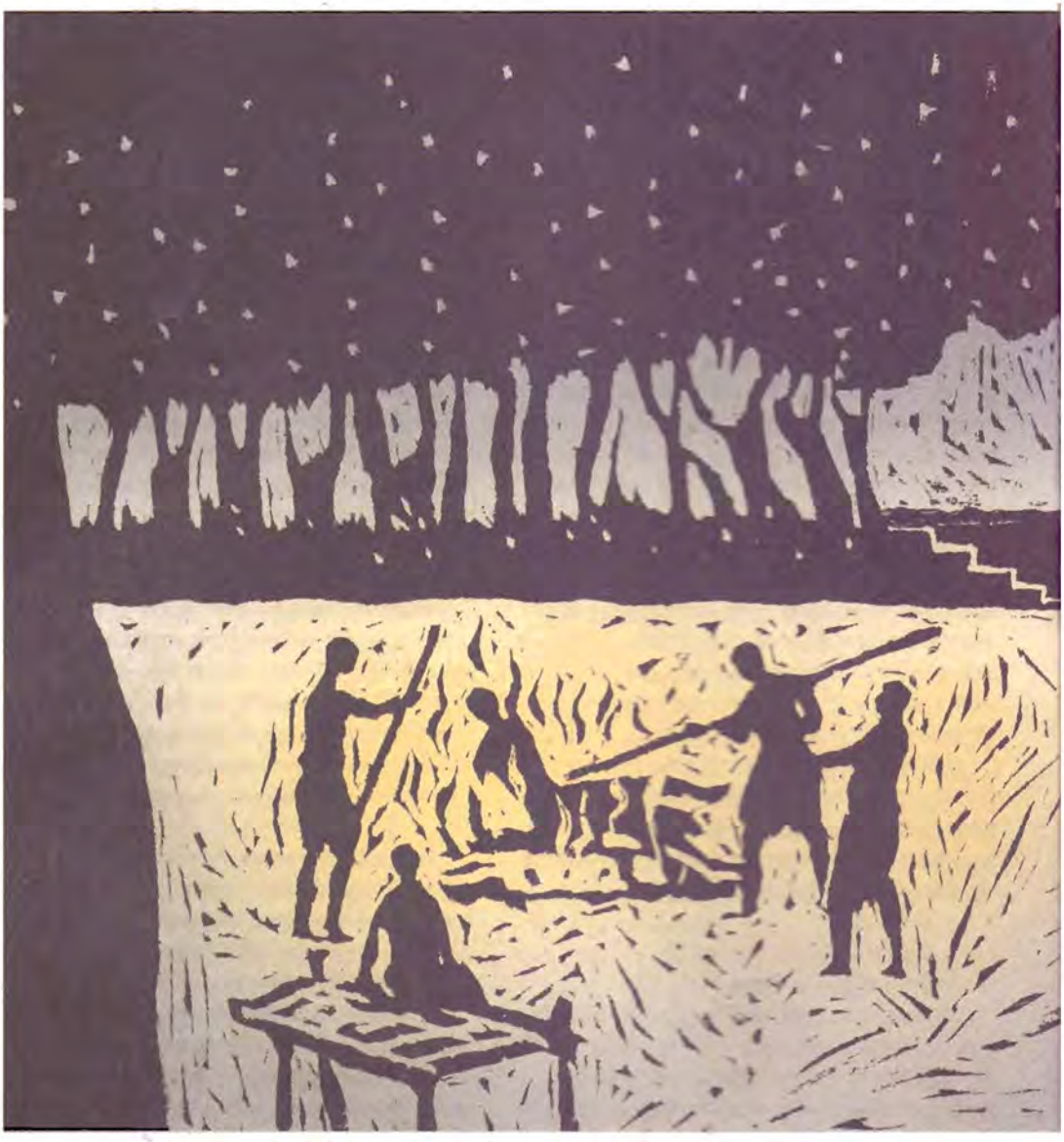

প্রস্থান কল্লে। কিন্তু তুমি এখন অমনি হঠাৎ করে পলায়ন কল্লে কি হয়। এখনও যে ভাত চড়েনি।

ভারত, বোঝা গেল তোমার বাক্ চাতুরি। তার মানে, অন্নদামঙ্গল। সেই অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে তাহলে বলি তোমায়। বিষয়টা হল, রাজা বল্লেন, কবিকঙ্কণ যে কায়দায় চণ্ডীমঙ্গল রচেছিলেন, আমায় সেই গড়নটি বজায় রেখে অন্নদা রচতে হবে। রাজা তো বলে খালাস। এখন আমার হল মহা বিপদ। কী করি, কী না করি, এই নিয়ে মনে মনে মহা দ্বন্দ্ব। ওধারে মাথার ওপর বসে আছেন বুড়ো মুকুন্দ। তাঁর চণ্ডীকাব্য তো পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেল আমার। ফলে তাঁর ঘের থেকে বার হওয়া—সে বড় খিটকেল। তখন নিজ হস্তে লেখনি তুলে না নিয়ে একজন ব্রাহ্মণকে লেখক রূপে নিযুক্ত কল্লেম। নিত্যি সকালে সেই বামুনটি আমার বাসায় আসেন। দৎ কলম আর পাতড়া পেড়ে বসেন। আমি মহাশক্তিকে মনে মনে স্মরণ করে মুখে মুখে রচনা করে বলে যাই। বামুন লেখেন। আর প্রতিদিন সন্ধেবেলা, যেটুকু লেখা হয়, নীলমণি সমদ্দর নামে একজন গায়ক সেই সদ্য রচিত পালা ভক্তি গীতের সুর, রাগ আর পাঁচালি আমার ঠেঙে শিক্ষা করে প্রতিদিন রাজসভায় গান করতে লাগলেন। রাজসভা প্রতি সন্ধেবেলা বেশ জম জম করতে লাগল। তবে একটি কথা, এই অন্নদামঙ্গলে আমি মানুষ থেকে ধরে দেবতা পর্যন্ত তুলে ধরলাম। মানুষ রাজা-গজা থেকে একেবারে শিব-মহামন্ত্র অন্নপূর্ণাদি।

প্রসাদ, ভালো তত্ত্ব কথা মানুষই তো শিব পঞ্চানন, মহামায়া জগদম্বা যাকে বলে আমাদের ঘরের মানুষ। তাহলে এবার একটু নমুনা বলো দাদা। মানে পহেলা দফেতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

ভারত, বেশ তাহলে রাজার সভা বর্ণন হতেই একটু কপচাই

প্রসাদ, ভাল কথা

ভারত, নিবেদন অবধান কর সভাজন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ।
চন্দ্রে সবে ষোলো কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।।
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে।।
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল।
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।।

নমুনা এই পর্যন্তই থাক। আসলে ভায়া, সত্যি কথা বলতে কী, তোমার মতো আগলছাড়া কবি হলে আপন মনে কাব্য রচতে পারতাম। কিন্তু যে কালে আমি রাজার নিগড়ে বাঁধা তাই তিনি ভিন্ন গতি কী আমার। তিনিই তো আমার অন্নদাতা ভগবান।

প্রসাদ, অন্ন যিনি জোগান, তিনিও তো কিঞ্চিৎ আশা ভরসা করেন। সব রাজাই বাসনা করেন কবির কলমে অক্ষয় হয়ে রইতে। তা না হলে সুমুখের কাল তাঁকে জানবে কেমন করে।

ভারত, কিন্তু ভাই, সব কবি লেখকই তো রাজাদের গুণ বন্দনা করেন। তাঁর যাবতীয় দোষ, কুমতি সব তুলে রেখে কেবল ভাল ভাল কথাই বলা হয়ে থাকে। তা না হলে, রাজা কুপিত হবেন। কবির পেটে পদাঘাত পড়বে। এও তো এক রাজনীতি।

প্রসাদ, ঠিক কথা। রাজনীতি মানেই শুধু সিংহাসন নিয়ে, ভূ-সম্পত্তি নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ নয়। নিজেকে অবতার জগদীশ্বর করে রাখা।

ভারত, হুঁ, দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বরো বা। এ তো আমাদের কবিদেরই রচনা।

প্রসাদ, কিন্তু দাদা, কালিদাস তো কয়েইছেন, পুষ্পহীনং সহকারমপি নোপাসতে ভ্রমরাঃ। সৌরভময় আমগাছ যদি পুষ্পহীন হয়, তা হলে ভ্রমরকুল তার কাছে যায় না।

ভারত, যথার্থ কথা। আমাদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অবিশ্যি গুণহীন নন। মানুষটি কৃতবিদ্য, পণ্ডিত আর রসিক। সে কারণেই তো আমি লিখে দিলাম,

দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে।।
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা।।
কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া।।

প্রসাদ, রাজা শক্তিমন্ত্রী হলেও বোষ্টমে অছেদ্দা নেই।

ভারত, হুঁ, সে বিষয়ে রাজা ভারী সচেতন, চতুর। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে তাঁর মন ভরল না। তিনি আমার একটু রসের কথা রচনা করতে বল্লেন। মনে মনে আমিও যেন তোয়ের ছিলাম। অমনি বিলম্ব না করে বিদ্যাসুন্দর-এ হাত দিলাম।

প্রসাদ, তোমার যে কৃষ্ণে অছেদ্দা নেই, তা নিয়ে একখানি নমুনা দাও দিকি। অর্থাৎ, রাজার শক্তিমন্ত্র রইলেও তিনি তো আচরণে বোষ্টম চূড়ামণি।

ভারত অমনি মহাউৎসাহে বলে ওঠেন,

একসম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন, বৈঠ নেহারী।
হয়ে লগ্ আউসর, দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল, নন্দলাল, বোলায়ি।।
দেখ্ নাহি আঁখ, শুন্ নাহি কান্।
কা কুছ আয়ি হো, আওল খায়ি।।
কাঁহাকে কানায়া লাল্ কাঁহা সো পছান্ জান্
কাঁহা সো তু, আয়ি হ্যায়, খাক্‌পর তেরে ব্রজ্‌কি বস্‌নে।।
পাণি মে আগ্ লাগাওনে আয়ি।
কুছ্ বাৎ এভোৎ কো, কুছ বাৎ ও তোৎ কো, বাতোন্ শুন্
বাৎ হামারি সাৎ, লাগায়ি হ্যায়।।

প্রসাদ অবাক নেত্রে তাকিয়ে রন ভারতচন্দ্রের প্রতি। তারপর বলে ওঠেন, দাদাগো, তোমার নীলে বোঝা দায়। এ যে খাসা হিন্দি ভাষার কবিতা। এখন বুঝতে পাচ্ছি, রাজা কেন তোমায় একেবারে কোলের কাছটিতে বসিয়ে রাখেন।

ভারত মৃদু হেসে বলেন, সেটাই তো বিপদের ভায়া। কবিতায় যথেচ্ছাচার করা যায় না। রাজা যাতে তুষ্ট হন, তাই করতে হয়।

প্রসাদ, একে কি রাজাচার বলা যেতে পারে!

ভারত, তা বলতে পারো ভায়া। তবে উল্টে যেন আমার কার্যকলাপকে পশ্চাচার বোলো না।

প্রসাদ, বীরাচারী, পশ্চাচারী, এমনকী বামাচারী—এইসব কথাবার্তাগুলো সমাজে আমার জন্যেই তোলা আছে দাদা। ওইগুলোই ভারি মুখরোচক। কিন্তু আমার ছিটেফোঁটা কবিতা-গীতকে এই সমাজেরই এঁটোকাঁটা দীন ভিখিরি আর মাঝি মাল্লারা বুঝি কদর দিল। সে জন্যেই মনে হয় বেঁচে আছি। তাই তো, শুধু ওইটুকুর জন্যেই বুঝি আমার মনে হয়, মানুষ হিসেবে বেঁচে আছি।

ভারত, ওইখানেই যে তোমার সার্থকতা ভায়া। তুমি সুপণ্ডিত হয়েও পণ্ডিতি ভুলে আকাট সাধারণ সেজে বসে আছো। ফলে পঞ্চজন সাধারণ মানুষ এক বাক্যেই তোমার মিতে হয়ে বসে। এ কপাল সকলের হয় না ভাই।

—কপাল!

—হ্যাঁ প্রসাদ। তুমি শুধু কালীর বেটা নও, সাক্ষাৎ কালের বেটা। তুমি অতি সহজ মতে কালাকাল হরণ করে বসে আছো। এ কি কম ভাগ্যি।

প্রসাদ, হয়েছে, হয়েছে। বিস্তর হয়েছে। এবার আগে বাড়ো দাদা। বিদ্যেসুন্দরের কিচ্ছে কও।

ভারত, হ্যাঁ, একে রসের হদ্দমুদ্দ কিচ্ছে ভায়া। রাজার বাসনা বলে কথা। দিলাম একেবারে আগুন জ্বেলে।

প্রসাদ, বটে।

ভারত, তবে একদিন দিব্যি মস্করা হল। একদিন সন্ধেবেলা রাজসভায় যেয়ে সদ্য রচিত বিদ্যাসুন্দরের পুঁতিখানি রাজাকে দণ্ডবৎ করে তাঁর শ্রীহস্তে অর্পণ কল্লাম। রাজা সে সময় মন্ত্রীগণের সঙ্গে কিছু গুরুতর বিষয়ঘটিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। এ জন্যে বুঝি ওই পুঁতির প্রতি বিশেষ গৌরব না করে শিরোধানের উপর সেটি রক্ষিত কল্লেন। তারপর আবার মন্ত্রণায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তা আমি আর কী করি। চুপটি করে বসে রইলেম। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা কিঞ্চিৎ অবসরপ্রাপ্ত হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বল্লাম, মহারাজ, অপরাধ গ্রহণ করবেন না, মদ্ররচিত পুঁতিখানা এভাবে শিরোধানের উপর হেলিয়ে রাখা উচিৎ নয়। ওই অবস্থায় অধিকক্ষণ রইলে কাব্যের রসাভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রসাদ, বটে বটে।

ভারত, তা, সুচতুর রাজা আমার ইঙ্গিতটি বুঝে নিবিষ্ট হলেন পুঁতিপাঠে। রাজা পুঁতি পড়েন। আমি চুপটি করে অপিক্ষে করি। রাজা হেঁটমুণ্ড। আমি স্থির নেত্র। তা একসময় রাজা মুখ তুল্লেন। আমার পানে চাইলেন। আমি কিছু বলার আগেই রাজা বলে উঠলেন, ভারত, তুমি যথার্থই কয়েছো। এই কাব্য মধ্যে রস একেবারে ঢলঢল করছে। অতএব এটি হেলিয়ে রাখলে রস গড়িয়ে পড়ার সম্যক সম্ভাবনা। ভারত, তুমি যথার্থই কবি। তোমার পরিশ্রম সার্থক।

প্রসাদ, নমুনা শোনার লোভ সামলাতে পাচ্ছিনে দাদা। কিন্তু বলতে গেলে, একেবারে খালি পেটে বদহজমি হবে না তো।

ভারত, লোভ যেকালে হয়েছে, তখন একটু বাঁচিয়ে বুঁচিয়ে সামান্য আওড়াই।

প্রসাদ এবার টানটান হয়ে বসেন।

ভারত, খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে
বিষম কুসুম শর খর শর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে।।
রতিন-সাগর নাগরী নাগর
সুন্দর-সুন্দরী কোলে।
চুম্বন-বদন মদন-রস-মোহিত
লোহিত কুচনেত বোলে।।
রতিমদ পাগর নাগরী-নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলপিল কুলুপ কপাটে।
ঝম্পই সঘন নিভঙ্গ ধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘনপর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে।।

প্রসাদ দু'হাত তুলে বলে ওঠেন, খ্যামা দাও দাদা, খ্যামা দাও। তুমি ঠিকই বলেছো এবার বুঝি সত্যি সত্যিই রসোচ্ছ্বাস ঘটবে। একে পেটের ক্ষুধা প্রবল। তারওপর তোমার ভাদ্দর বউ অনুপস্থিত।

ভারত, হুঁ, রাজাও আমার মনোবেদনা সমঝালেন। তিনি বল্লেন, তোমার গৃহিণী আর সংসারাদির খপর বলো। আমি বল্লেম, আজ্ঞা, আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন। ভ্রাতাগণের সঙ্গে আমার যথাযথ সদ্ভাব নেই। এ জন্য বাটিতে যাওয়ার অভিলাষ হয় না।

প্রসাদ, তখন রাজা নির্ঘাৎ একটি বিধেন দিলেন।

ভারত, আমিই বল্লাম, গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পেলে পরিবার নিয়ে বাস করতে পারি

প্রসাদ, একেই বলে আদিরসের গুঁতো। রাজা কেমন ঢলে পড়ছেন দেখছি।

ভারত, রাজা আমায় মূলাযোড়ে বাস করার আদেশ কল্লেন। আর বাটীর নিমিত্ত একশত টাকা দিলেন। আর বার্ষিক ছয়শত টাকা রাজস্ব নির্দিষ্ট করে গোটা মূলাযোড় গ্রামখানি ইজারা দিলেন। আদপে আমার মনোবাসনা ছিল, যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি এমন কল্পতরুর আশ্রয় পেয়েছি, তাঁর বাটির কাছাকাছি থাকার। তাহলে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। আসলে বুদ্ধিমান রাজা আমার মনোবাসনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আমায় মূলাযোড়ে গিয়ে বাস করতে বল্লেন।

প্রসাদ, ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্তুর্দ্বারেক্ষণপরায়ণা।।

ভারত হেসে কন, স্বামীর আগমন নিশ্চয় করে যে নারী আপনার অঙ্গ আর রতিগৃহ সুসজ্জ করে দ্বারের পানে চেয়ে থাকে তার নাম বাসসজ্জা।

ছবি শান্তনু দে

(চলবে)

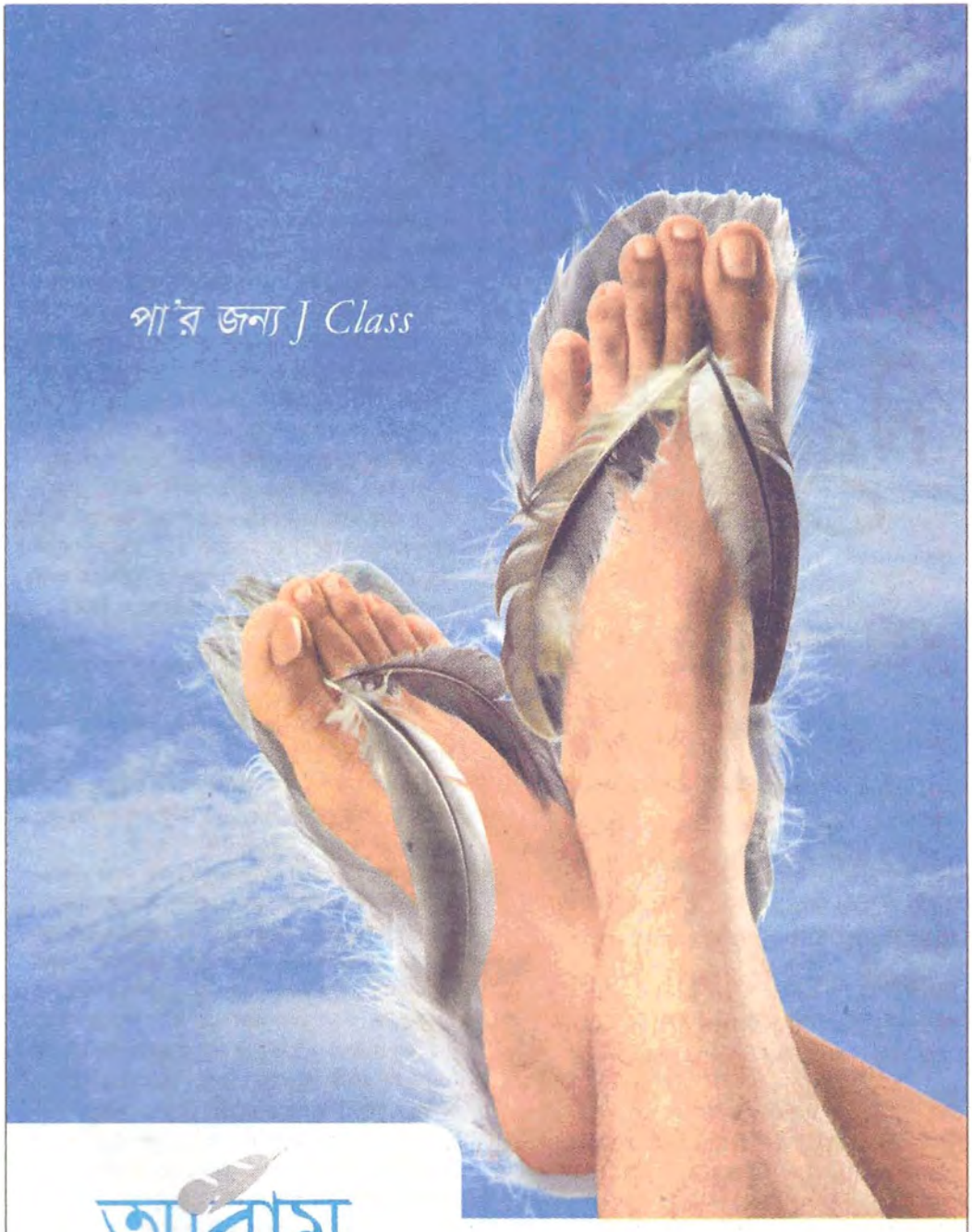

পা'র জন্য J Class
আরাম
অবিরাম
শ্রীলেদার্স নিয়ে এলো বিশ্বমানের আরামদায়ক জুতোর
এক নতুন রেঞ্জ। আর দাম? যথারীতি নাগালের মধ্যে।
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Genesis 2353

কলিকাতায় নবকুমার

সমরেশ মজুমদার

সোনাগাছির বাড়ি নিয়ে শেফালি মা ঝামেলায় পড়েছেন। সবিতারা সময় চেয়েছে, আর যে ভদ্রলোক বাড়ি কিনতে এসেছিলেন তাকে শেফালি মা'র পছন্দ নয়। বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে ভবানীপুরে যাওয়া সম্ভব নয়, ওদিকে নবকুমার অসুস্থ। মন্দাক্রান্তাকে ফোন করেন শেফালি মা। নবকুমারের শ্যুটিং-এর কথা জানতে পারেন। বড়বাবু মন্দাক্রান্তার বাড়িতে যান। সেখানে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

উনষাট

মন্দাক্রান্তা হাসলেন, 'নবকুমারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তা আমি জানি না!'

'কথার খেলা খেলো না মন্দা।' বড়বাবু গম্ভীর গলায় বললেন।

'মনে হচ্ছে আপনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। তোমার কার্যকলাপই বলছে তুমি এই গ্রাম্য মফস্বলের অর্বাচীনের প্রতি অনুরক্ত। অথবা এও হতে পারে, তুমি ওকে পুতুলের মতো ব্যবহার করছ। তোমার খেলার পুতুল। কিন্তু আমি যাই ভাবিনা কেন, তোমাকে মুখ খুলতে হবে।'

মন্দাক্রান্তা বড়বাবুর দিকে তাকালেন, 'নবকুমারকে আমি স্নেহ করি।'

'স্নেহ!' ছিটকে বেরুল শব্দটা বড়বাবুর মুখ থেকে।

'হ্যাঁ। দু'জন নারী পুরুষ মানেই তাদের সম্পর্ক শরীরের ছাড়া আপনারা ভাবতে পারেন না। মাঠে একটি গরু শুয়ে থাকলে যেমন আকাশে ওড়া শকুন তাকে মৃত বলে ভেবে নেয়। না নবকুমারকে আমি ভাই বলে কখনও ভাবিনি কিন্তু ওর প্রতি যে টান অনুভব করি সেটা স্নেহ ছাড়া আর কিছু নয়, অন্তত এই মুহূর্ত পর্যন্ত নয়।'

'কিন্তু আমি চাইনা তুমি ওকে প্রশ্রয় দাও। এই টান বা স্নেহ প্রকাশ করা তোমাকে মানায় না। একটা চাষার ঘরের কোনওমতে বি.এ পাশ করা গ্রাম্য ছেলে সে, আর কোথায় তুমি! ছি ছি ছি!'

'আমি কোনও অন্যায় করছি না। এই বাড়ি, গাড়ি, টাকা পয়সা যা আপনি আমার নামে তৈরি করেছেন ইনকামট্যাক্স বাঁচাতে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এখন পর্যন্ত আমি করিনি। আপনি ওকে নিষেধ করেছেন আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। আমাকে না জানিয়ে একথা ওকে বলা মানে যে আমাকে অপমান করা তা আপনার মাথায় ঢোকেনি। আমাকে ছি বলার আগে নিজেকে বলুন।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'তুমি, তুমি ওই একটা ফালতু ছেলের জন্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ?'

'ঝগড়া করছি না। আপনার করা প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে বাধ্য হচ্ছি।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন বড়বাবু। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমার এই একটা অনুরোধ রাখতে তোমার এত অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

'কারণ এর আগে কোনও পুরুষ ওর মতো চোখে আমার দিকে তাকায়নি, আমার শরীর, আমার সৌন্দর্য মানে ভোগের জন্যে তৈরি, এই তো জেনে এসেছি এতদিন, আপনি আমার মাথার ওপর ছাতা ধরতে কেউ আর সরাসরি প্রস্তাব দেওয়ার সুযোগ পায় না কিন্তু কেনাকাটার জন্যে যখন মার্কেটে যাই তখন আশেপাশের পুরুষের চোখের দৃষ্টি চিনতে অসুবিধে হয় না। সব এক। এই প্রথম একটি ছেলেকে দেখলাম যে আমার শরীর সম্পর্কে আদৌ আগ্রহ দেখায়নি, আমার সৌন্দর্যে কোনও আকর্ষণ বোধ করেনি। ওর জন্যে কিছু জামাকাপড় কিনেছিলাম, সেগুলো পড়েই আছে এখানে একবারও বলেনি ওগুলোর কথা। এখনও আমি কাউকে একবার ডাকলে সে দশবার ছুটে আসবে কিন্তু দেখুন গিয়ে, ও হয়তো আমার বাড়ির রাস্তাই ঠিকঠাক মনে রাখতে পারেনি। আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। এত ভয় যে শ্যুটিং বন্ধ করে ওকে সরাতে চেয়েছেন। আমার কাছে আপনি এত নীচে নেমে যাচ্ছেন কেন?'

বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'শোনো, আমি পরিষ্কার কথা জানতে চাই!'

'বলুন।'

'তুমি কি ওর সঙ্গে শুয়েছ?'

শব্দ করে হেসে উঠলেন মন্দাক্রান্তা। তারপর বললেন, 'মিছেই এতক্ষণ এত কথা বলালেন আমাকে দিয়ে। ওকে নষ্ট করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি

না।'

'যাক। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' বড়বাবু বললেন, 'আসলে, কী করে বোঝাই, তোমার কোনও অসুখ তো আমি রাখিনি। তাই তুমি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে আমি ভয় পাই।'

'ভয় কেন?'

'তোমাকে যা দিয়েছি তা নিয়ে তুমি যে কোনও মুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করতে পার।'

'পাগল। যতই রোবট হয়ে থাকি, নিজের ভাললাগাগুলো বিসর্জন দিয়ে মন্দলাগাগুলো নিয়ে এই বৈভবের মধ্যে যতই একা হয়ে থাকি কিন্তু কেউ আমার শরীরটাকে বিরক্ত করে না। আপনি না থাকলে সেইসব নোংরা কালো হাতগুলো নখ বের করে ছুটে আসবে। এই ভুল কি আমি করতে পারি?' মন্দাক্রান্তা শ্বাস ফেললেন।

'কেন? আমাকে ত্যাগ করে পছন্দসই কোনও ছেলেকে তো বিয়ে করতে পার!'

'বিয়ে? আমি? কে আমাকে বিয়ে করবে? কেন করবে? বাড়িগাড়ি টাকার জন্যে যে রাজি হবে তার তো একটাই উদ্দেশ্য থাকবে, আমাকে সরিয়ে দেওয়া।

আপনারা, পুরুষ মানুষরা দশটা মেয়ের সঙ্গে শুয়েও যখন বিয়ে করতে যান তখন গঙ্গাজলের মতো পবিত্র থাকেন। আর আমার মতো মেয়েরা তো নোংরা জলের ডোবা। যে জলে হাতমুখ ধুতে ঘেন্না করে তা পান করার কথা ভাবা যায় না।

বড়বাবু এগিয়ে এসে মন্দাক্রান্তার কাঁধে হাত রাখলেন।

মন্দাক্রান্তা বললেন, 'ভাল লাগছে না, হাতটা নামান।'

'ও। আচ্ছা, আমি চলি।' বড়বাবু হাত নামালেন।

'তাহলে কি কাল থেকে শ্যুটিং হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে কথা দিয়েছি যখন তখন—।'

'বেশ। তাহলে আপনার আদেশ আমি মেনে নিচ্ছি।'

'আদেশ? না না। ওটাকে আদেশ বলো না। আমি ভুল ভেবেছিলাম। কাউকে স্নেহ করে যদি তুমি একটু ভাল থাকো তাহলে আমারও ভাল লাগবে। চলি, শনিবার আসব। রাত্রে খেয়ে যাব।' বড়বাবু চলে গেলেন।

সকাল আটটায় গাড়ি এসে গেল।

আজ ব্যথা অনেক কম। আস্তে হাঁটলে অসুবিধে হচ্ছে না। নবকুমার স্নান সেরে নিয়েছিল। মুক্তো জিজ্ঞাসা করল, 'কখন ফেরা হবে?'

'জানি না।'

'জানি না বললে তো হবে না। মা বলেছিল তোমাকে আজই সোনাগাছিতে নিয়ে যেতে। দিনে দিনে যেতে হবে।' মুক্তো গলা তুলল।

'কখন আসতে পারব সেটা তো ওদের ওপর নির্ভর করছে।'

মুক্তো গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে হতাশ হল। লোকটার কাজ নিয়ে যাওয়া। কখন শেষ হবে তা সে জানবে কী করে! কিন্তু ফিল্ম লাইনের ড্রাইভার বলে সে অনায়াসে বলে দিল, 'বন্ধ থেকে আবার শুরু হচ্ছে তো, তা ধরে নিন রাত এগারোটা তো হবেই', ভরসা পেল মুক্তো। সারাদিন এই বাড়িতে ভূতের মতো বসে না থেকে সে সোনাগাছি থেকে ঘুরে আসবে বলে ঠিক করল। হাজরার মোড় থেকে পাতাল রেলে চড়লে মিনিট পনেরোর মধ্যে শোভাবাজারে নেমে সোনাগাছিতে ঢোকা যায়।

সকালের কলকাতার পথঘাট বেশ নির্মল থাকে। ছুটন্ত গাড়ির পেছনের সিটে বসে নবকুমারের বেশ ভাল লাগছিল। ডানদিকে বসুশ্রী সিনেমা। তার মাথায় হিন্দি ছবির নায়ক-নায়িকার ছবি। হিন্দি ছবিতে যারা অভিনয় করে তাদের কত কী জানতে হয়। নবকুমার একটু পাশ ফিরতেই কোমরে খচ করে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা গিলল সে।

স্টুডিওর ভেতরে গীতিময়ের অফিসের সামনে গাড়ি না থেমে চলে এল একেবারে মেক আপ রুমের কাছে। একজন সহকারী পরিচালক ছুটে এসে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন আছ?'

'এখনও—।'

'যাই হোক। এমনভাবে নেমে হাঁটবে যেন কেউ বুঝতে না পারে তুমি অসুস্থ। শালারা হেভি পেঁদিয়েছিল দেখছি। মুখের ঘা এখনও শুকায়নি। নামো।'

প্রায় আড়াল করে নবকুমারকে নিয়ে ছোট ঘরে ঢুকল সহকারী পরিচালক।

'হাঁটতে কষ্ট হল?'

'সামান্য।'

'বসো। এখনই মেক আপ ম্যান এসে যাবে। চা খাবে?'

'না।'

নবকুমার একটা চেয়ারে বসতেই ছেলেটা বেরিয়ে গেল। আয়নায় নিজেকে দেখল সে এখনও মুখ ফোলা, কপালে এবং গালে কালসিটে. কাঁচা চোখ বন্ধ করল সে।

এইসময় গীতিময়ের গলা কানে আসতেই সে মুখ ফেরাল। চেয়ার টেনে পাশে বসে গীতিময় বললেন, 'শোনো নবকুমার, এটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ। আমি তিনদিন শ্যুটিং করব তোমাকে নিয়ে তারপর দিনসাতেক বিশ্রাম পাবে। ওই সময়ে শরীর ঠিক করে ফেলতে হবে। এখন কেমন বোধ করছ?'

'আগের থেকে ভাল।'

'দেখি মুখখানা।' গীতিময় এগিয়ে এলেন। নবকুমার মুখ তুলল।

গীতিময় বললেন, 'অনেকটাই শুকিয়েছে। কমল!' গলা তুললেন গীতিময়

'আছি।' পেছন থেকে মেক আপ ম্যানের সাড়া এল।

'যেমন বলেছিলাম তেমন করে নও' গীতিময় উঠে পড়লেন।

প্রায় দেড়ঘণ্টা লাগল মেক আপ শেষ করতে। ছেঁড়া জামা পরতে হল। দেখলেই মনে হবে এইমাত্র খুব মারধোর খেয়ে এসেছে মেক আপ ম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'কালসিটের জায়গাগুলোয় কিড়কিড় করছে না তো?' নবকুমার মাথা নেড়ে না বলল

ঠিক বারোটার সময় নবকুমারকে স্টুডিওর ফ্লোরে নিয়ে যাওয়া হল। যাওয়া মাত্র দশ-বারোটা ক্যামেরা তার ছবি তুলতে লাগল। গীতিময় ক্যামেরাম্যানদের বললেন, 'আগে শ্যুটিং শেষ হোক তারপর ছবি তুলবেন?'

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, ক্ষতগুলো অরিজিন্যাল না মেক আপ?'

'অভিনয় মানেই মেক আপ ছবিতে অরিজিন্যাল দেখালেই হল।'

'ও। শুনেছিলাম ওকে নাকি পুলিশ খুব মারধোর করেছে?'

'কে বলল একথা? সব অ্যান্টিপার্টির বানানো কথায় আপনারা কেন যে কান দেন।'

'অ্যান্টিপার্টি মানে?'

'একটা নতুন ছেলেকে হিরো করেছি বলে অনেকেই খুশি হয়নি। ঠিক আছে, এবার আপনারা জোন থেকে সরে যান। এসো নবকুমার ' ডাকলেন গীতিময়।

অত্যন্ত সতর্ক হয়ে হাঁটল নবকুমার। কোমরের ব্যথাটা যেন কেউ বুঝতে না পারে এমনভাবে পা ফেলল।

সামনেই একটা বন্ধ দরজা। পাশেই বেল বাজাবার বোতাম। গীতিময় নবকুমারকে বুঝিয়ে দিলেন। বন্ধ দরজার সামনে এসে সে ইতস্তত করবে। একটু আগে মার খেয়েছে বলে শরীরে তীব্র ব্যথা। সেই ব্যথাটা মুখ

চোখে এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বোঝাতে হবে। তারপর হাত তুলে বেলের বোতামটা টিপে এক পা সরে দাঁড়াবে। দু-দু'বার বুঝিয়ে গীতিময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝতে পেরেছ তো?'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

'তাহলে রিহার্সাল নয়, একটা মনিটার করি?'

মনিটার শব্দটার মানে স্পষ্ট না হওয়ায় চুপ করে থাকল নবকুমার। গীতিময় চিৎকার করলেন, 'অল লাইটস। সাউন্ড রেডি? স্টার্ট ক্যামেরা। অ্যাকশন!'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সেট আলোয় ভরে উঠল। গীতিময় যেমন বলেছিলেন ঠিক সেইরকম অভিনয় করল নবকুমার। ব্যথার অভিব্যক্তি ফোটানোর সময় ওর আরাম লাগল। অনেকক্ষণ পরে চেপে রাখা ব্যথাটাকে উপড়ে দিতে পারল।

'কাট।' গীতিময় চিৎকার করলেন, 'নেক্সট শট। ভেতর থেকে।'

একজন অ্যাসিস্টেন্ট পরিচালক মনে করিয়ে দিল, 'দাদা, এটা মনিটার ছিল।'

'একদম যা চেয়েছি তাই হয়েছে।' তারপর ক্যামেরাম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন গীতিময়, 'কি? ছবি ঠিক ছিল?'

'যা বলেছিলেন তাই। দশে দশ।'

আড়াইটে নাগাদ লাঞ্চ ব্রেক। শরীর শক্ত করে হেঁটে নবকুমার মেক আপ রুমে চলে এল। সাংবাদিকরা ঢুকতে চাইছিল কিন্তু মেক আপ ম্যান কমল বাধা দিল, 'এখন ওকে খেতে দিন। যা জিজ্ঞাসা করার শ্যুটিং শেষ হলে করবেন।' দরজা বন্ধ করে মেক আপ ম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'খুব ক্ষিদে পেয়েছে তো?'

'না। আমি একটু, শুতে পারি? খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই। ওই ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়।' শরীর এলিয়ে দিতে বেশ আরাম লাগল।

'কাজ খুব ভাল করেছ ভাই। সাবাস! চালিয়ে যাও।'

নবকুমার জবাব দিল না। সে চোখ বন্ধ করল। তাকে এই তিনদিন যেমন করে হোক ভালভাবে কাজটা শেষ করতেই হবে। তারপরে তো বিশ্রামের সময় দেবেন গীতিময়বাবু। নৌকো থেকে পড়ে জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল সে। মন্দাক্রান্তা আর গীতিময়বাবু তাকে আবার ওপরে টেনে তুলেছেন। আর এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করবে না। যত ব্যথা হোক, সে সহ্য করবে। কাউকে বলবে না। এই কাজ করলে যে টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে শেফালি মায়ের ঋণ শোধ করতে হবে।

নবকুমারের অভিনয় দেখে ফ্লোরের সবাই খুব খুশি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে যেভাবে পড়ে গেল, গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল, মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটিয়ে তুলল তা মুগ্ধ হয়ে দেখল দর্শকরা। খুব বড় জাতের অভিনেতা ছাড়া এরকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যে কাজের লোকটি তাকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছিল সে হকচকিয়ে গিয়েছিল, কারণ নবকুমারের পড়ে যাওয়ার কথা চিত্রনাট্যে ছিল না। কিন্তু নবকুমার আবার উঠে এগিয়ে আসতে বেচারি জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'লেগেছে?' নবকুমার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলে ওপরে ওঠার জন্যে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গীতিময় চিৎকার করলেন, 'কাট।'

কাজের লোকের চরিত্রে যিনি অভিনয় করছিলেন তিনি হাতজোড় করলেন, 'সরি দাদা। উনি পড়ে গিয়েছেন দেখে মুখ থেকে ফস করে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল।'

গীতিময় বললেন, 'সরি বলার দরকার নেই। দারুণ লেগেছে, স্বতোস্ফূর্ত ব্যাপার। সুনীলদা তোমরা পুরনো দিনের অভিনেতারাই এটা করতে পারো। আমি তোমাকে বলিনি নবকুমার পড়ে যাবে। ওর মার খাওয়া শরীর তো তরতর করে উঠে যেতে পারে না। তুমি ম্যানেজ করে নিয়েছ। আজ এই পর্যন্ত থাক। প্যাক আপ ফর দি ডে।'

ক্যামেরাম্যান এগিয়ে এল গীতিময়ের কাছে, 'অসাধারণ শট দিল ছেলেটা। মুখে যে যন্ত্রণার ছাপ ফোটাল সেটা এত স্বাভাবিক, পাবলিক খেয়ে যাবে। আপনি দারুণ আবিষ্কার করেছেন দাদা।'

'নবকুমারকে মেক আপ রুমে নিয়ে যাও।' গীতিময় সহকারীকে বললেন।

ইজি চেয়ারে শোওয়া অবস্থায় মেক আপ ম্যান মেক আপ তুলে ফেলেছিল। কালসিটের জায়গাগুলো স্পিরিট দিয়ে মুছিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কষ্ট হচ্ছে নাকি?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না।'

গীতিময় ঢুকলেন, 'কী ব্যাপার বলোতো? তোমাকে তো পড়ে যেতে আমি বলিনি।'

নবকুমার উঠে বসার চেষ্টা করল, 'কোমরের কাছে এমন যন্ত্রণা হল, সহ্য করতে পারলাম না।'

'বুঝেছি। কিন্তু মজার কথা হল, লোকে এটাকেই অভিনয় বলে ভাবছে। এর মধ্যেই তোমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে সবাই। আর হ্যাঁ, বড়বাবু তোমার পারিশ্রমিকের আগাম হিসেবে ছয় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিয়ে যেও। আর ওষুধটা খেও।'

রাত আটটার সময় ওরা ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছে দিল নবকুমারকে। গাড়ি থেকে নেমে দরজার সামনে গিয়ে নবকুমার অবাক। দরজায় বড় তালা ঝুলছে।

(আগামী এপিসোডে শেষ)

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র ভারতী থেকে বেরুচ্ছে চিরদিনের মেগা-উপন্যাস

কলিকাতায় নবকুমার

সমরেশ মজুমদার

২০০

আরও বই
স্বপ্নেই এমন হয় ৭০
সমরেশের সেরা ১০১ ৩০০
জীবনটাকে চেখে দেখুন ৭০
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস ১২০

৩/১ কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫
৯৪৩৩০ ৭৫৫৫০

সেন সলিউশনস

হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস। চিন্তা কীসের, আপনার কাছে রাইমা আছে

আমি সাতচল্লিশ বছর বয়সি গৃহবধূ। যথেষ্ট পড়াশোনা করা সত্ত্বেও কোনওদিন চাকরি-বাকরির কথা ভেবে দেখিনি। সংসারে তেমন প্রয়োজন হয়নি বলেই। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত। এখন যদি আমি লাভজনক কিছু করতে চাই, বাড়িতে বসেই, তাহলে কী কী উপায়ে সেটা সম্ভব? আমি ভাল রান্না করতে পারি, একসময় সেলাই পারতাম ভাল, আর গানবাজনা ভালবাসি।

—অনুরাধা চৌধুরি, হাতিবাগান

আপনি যখন ভাল রান্না করতে পারেন, তখন এটাকেই বিজনেস হিসেবে নিন। হোম ডেলিভারি এবং অফিস ডেলিভারি আজকাল বেশ লাভজনক ব্যবসা। প্রথম প্রথম হয়তো অর্ডার পাওয়ার জন্য এদিক ওদিক ছুটতে হতে পারে। তারপর সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারলে, আর বেশি ছোটাছুটি করতে হবে না। প্রথম প্রথম লোকাল এরিয়ায় হোম ডেলিভারির ব্যবসা শুরু করুন। তারপর অফিসগুলোর অর্ডার ধরার চেষ্টা করুন। এছাড়া বাড়িতে টিউশন করে বা সেলাই-এর অর্ডার নিয়েও রোজগার করতে পারেন। যে তিনটে অপশন আপনাকে দিলাম, সবকটাই লাভজনক। এছাড়া আরও অনেক ধরনের ব্যবসা আছে, যেগুলো বাড়িতে বসেও করা যায়। তবে সেগুলো একটু বেশি খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। এবার আপনাকেই ডিসিশন নিতে হবে, কোন কাজটা আপনি করবেন।

আমি টুয়েলভ-এ পড়ি। আমার সব বন্ধুবান্ধবরা কোচিং থেকে ফেরার পথে বেশিরভাগ দিনই রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। সমস্যা হল, আমাকে বাড়ি থেকে এত কম পকেটমানি দেয় যে, আমি ওদের সঙ্গে খেতে যেতে পারি না। ফলে আমাকে প্রায় রোজই মনমরা হয়ে বাড়িতে ফিরতে হয়।

—দেবাঙ্গনা ভট্টাচার্য, লেকটাউন

তোমার বয়স কত যে, বাড়ির লোকজনের থেকে বেশি অ্যামাউন্ট-এর পকেটমানি আশা করছ? রোজ রোজ রেস্তোরাঁয় খাওয়া কি খুব কাজের কথা? পেটটা যে যাবে, সেদিকে খেয়াল আছে? আমি বলছি না যে, বন্ধুদের সঙ্গে একটু আধটু মজা করবে না, বা রেস্তোরাঁয় যাবে না। তবে সেটা মাঝে মাঝে। যখন রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে, তার আগে বাবা মাকে বলেই টাকাটা চেয়ে নেবে। আর সবশেষে বলব, বাবা মা যা বলেন, যা করেন, আমাদের ভালর জন্যই বলেন এবং করেন। অযথা মন খারাপ করো না, কেমন।

আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি। কিছুদিন আগে একটি ছেলে আমায় প্রোপোজ করেছে। ছেলেটি আমার চেয়ে বয়সে বছর দশেকের বড়। ছেলেটিকে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার বয়সের এত ডিফারেন্স যে, এই ব্যাপারটাই মেনে নিতে পারছি না আমি। এদিকে ছেলেটি যদি আমার 'না' শুনে কষ্ট পায়, সেই ভেবে আমি ওকে নেগেটিভ কিছু বলতেও পারছি না। তুমি প্লিজ ওকে কাটানোর একটা উপায় বলে দাও।

—সৌমিতা চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর

শোনো, দু'নৌকায় পা দিয়ে কখনও চলা যায় না। হয় ছেলেটিকে 'হ্যাঁ' বলো, নাহলে 'না' করে দাও। ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখো না। তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, ছেলেটিকে তোমার ভাল লাগে, কিন্তু তুমি তাকে ভালবাস না। দ্যাট মিনস, এটা জাস্ট একটা ইনফ্যাচুয়েশন! দেখো, কাউকে সত্যিকারের ভালবাসলে বয়সের ডিফারেন্স ব্যাপারটা কোনও ম্যাটার-ই করে না। এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ। কোনও রিলেশনে এনগেজড হওয়ার আগে, মানুষটাকে জানো, বোঝো, চেনো ভালভাবে। আর তুমি এখন অনেক ছোট। পড়াশোনাটা মন দিয়ে করো। প্রেম করার বয়স ফুরিয়ে যায়নি। ছেলেটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে বললে, আশা করি সে রিয়ালাইজ করবে গোটা ব্যাপারটা।

আমি চাকরি করি। সারাদিনের খাটাখাটনির পর যখন বাড়ি ফিরে একটু টিভি দেখতে বসি, তখনই আমার শাশুড়ি মায়ের ফেভারিট সিরিয়াল দেখার সময় হয়। এত বিরক্ত লাগে তখন, যে সেকথা বলার নয়। কিছু বলতে পারি না ওঁকে, পাছে যদি কষ্ট পান! কী করা যায় বলো তো?

—মল্লিকা দাশগুপ্ত, বেহালা

আপনি একটা কাজ করুন না। আজকাল অনেক কম দামে ছোট কালার টিভি কিনতে পাওয়া যায়। সেগুলোরই একটা শাশুড়ি মাকে কিনে দিন। আর নাহলে ওঁর সিরিয়াল দেখা হয়ে গেলে তারপর টিভি দেখতে বসুন। আসলে বয়স হলে অনেক মানুষেরই টিভি দেখার নেশাটা বাড়ে। আপনারও যখন বয়স হবে, দেখবেন আপনারও টিভি দেখার নেশা বাড়বে। কাজেই এই নিয়ে এত মাথা ঘামাবেন না। যেটা বললাম, সেটা করলেই আশা করি, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমার স্কিন ড্রাই। কীভাবে যত্ন নেব?

—অনিন্দিতা ঘোষাল, কোন্নগর

তুমি একটা কাজ করো। মুসুর ডালের গুঁড়োর সঙ্গে দুধ মিশিয়ে মুখে লাগাও। পাঁচ মিনিট পর সামান্য জল নিয়ে হালকা হাতে ঘষে নেবে। তারপর মধু, আপেল, আমন্ড ও দুধের সর একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগাবে। আধ ঘণ্টা পর ধুয়ে গোলাপ জলের সঙ্গে একটু ময়শ্চারাইজার মিশিয়ে লাগিয়ে নেবে। সপ্তাহে দু'দিন এই প্যাক ব্যবহার করবে। এছাড়া রাতে শুতে যাওয়ার আগে ব্র্যান্ডির সঙ্গে দু'ফোঁটা অলিভ অয়েল মিশিয়ে লাগালে উপকার পাবে।

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

মেড ই(জি) টেরানিয়ান

আফরার আখড়ায় ভূমধ্যসাগরের ঢেউ। সঙ্গে ফ্রি পাচ্ছেন মিটবল ইন বারবিকিউ সস। কলকাতার কালার প্যালেটে নতুন জলপাই শেড।
গীতিষা দাশগুপ্ত

বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা হঠাৎ ভূমধ্যসাগরের পার থেকে একরাশ অবাক এসে উপস্থিত আমাদের দপ্তরে, খামের উপর লিখব কী লিখব-না হস্তাক্ষরে লেখা 'আফরা'র নিমন্ত্রণ। কলকাতায় মেডিটেরানিয়ান সত্যিই কম—নেই বললেও চলে একেবারে। কারণ, যা আছে, তা আরও ফোকাস্‌ড—সাধারণত ইতালিয় গোত্রের। অথচ, একসঙ্গে গোছা করে ধরলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খাবারদাবার যে কতখানি আকর্ষণীয় হতে পারে, তা দেখা গেল এবার আফরায়।

ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় সিটি সেন্টারে ইতিউতি খুঁজে খুঁজে শেষমেশ জি ব্লকের চুড়োয় উঠে নাগাল পেলাম আফরা লাউঞ্জের। 'লাউঞ্জ' নামক বস্তুটির কলকাত্তাইয়া বয়স বছর তিনেক মেরেকেটে। তার আগে কলকাতাবাসী রেস্তোরাঁয় যেত কেবলই খেতে। অবশ্য, আপনি যদি কট্টর স্বদেশি হন, তবে এক্ষুনি বলবেন পাঞ্জাবি ধাবার কথা—সেও তো একরকম লাউঞ্জই বটে—খোলা আকাশের নীচে, শুয়ে-বসে-আড্ডা মেরে যতক্ষণ ইচ্ছে কাটিয়ে উদরপূর্তি এবং মনের ফুর্তির বন্দোবস্তি। সত্যিই, কেতাদুরস্ত, পকেটপুরস্ত জনগণের এখন আর রেস্তোরাঁর একটা টেবিল ঘিরে পাঁচটা চেয়ার আর ওয়েটারের মৃদু হাসির সঙ্গে খাবার শেষ হওয়া মাত্র চোখের কোণে 'ফুট লে' ইশারা পোষাচ্ছে না। লাউঞ্জ কী, বুঝতে পারছেন না তবুও? 'রং দে বসন্তি' দেখেছেন তো?—সেই যে বন্ধু-বান্ধবদের সান্ধ্য আড্ডার বাড়ির কিন্তু বাড়ির নয় মার্কা বসবার জায়গা, সোফাটোফা দিয়ে সাজানো, মাঝখানে বেশ অসুবিধাজনকভাবে নিচু সেন্টার টেবিল (চাইলেও খাবার টেবিল বানাতে পারবেন না সেটাকে)—সেটাই হল সাধারণভাবে লাউঞ্জের ছবি অর্থাৎ life does not end with eating out only. it's also about hanging out. আর, এই ঝুলে ঝুলে বেড়াবার জন্য লাউঞ্জই আপাতত ইন—জায়গার অভাবে ইনডোর—হাইওয়ের ধার ছাড়া ধাবার মতো অত জায়গা কে দেবে? আর সেখানে অফিসফেরতা শহুরে জনগণকে রোজ রোজ টেনে নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

লাউঞ্জের সঙ্গে অতি অবশ্যই প্রয়োজন ভদ্রমতো একটা মদ্যপানের ঠেক—অর্থাৎ বার। আফরা কর্তৃপক্ষের দাবি, সেটাও রয়েছে এখানে, পুরোদস্তুর। সঙ্গে সুপার এফিশিয়েন্ট বারসার্ভিস এবং ডি জে আধুনিক এবং

শুদ্ধতার
আর এক নাম
আহা! স্বাদে দারুণ
S.D. TM
MASALA
DUTTA FOOD PRODUCTS PVT. LTD. CITY OFFICE : AB 103, SECTOR 1, SALT LAKE, KOLKATA 700064, Ph 2359 4211/2321 9164

অত্যাধুনিক। আফরার আরও একটা অ্যাম্বিশন-ফাইভ স্টার সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড।

আফরা লাউঞ্জে যেটা সবচেয়ে নজর কাড়ে, তা হল ইন্টিরিয়র ডেকর। সবকিছু অপলক সাদা। সেটাই আফরা কথাটার মানে। ভাষাটা আরব্য। গরমে আরামই আরাম।

আবার ফিরে আসি খাবারে। মেডিটেরানিয়ান কুইজিন বলতে কিন্তু বোঝায় গোটা অঞ্চলটার খাদ্য-পানীয়ই। আমি যদি সেটাকে একটা ব্র্যাকেটে সারতে যাই, তা হলে অন্যায় হবে। তার চেয়ে বরং স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, গ্রিস, ইতালি, লেবানন প্রভৃতি দেশের খাবার একগোছা করলে যা দাঁড়ায়, তাই ভূমধ্যসাগরীয়। শুনলেই মনে হয় কমলালেবু আর আঙুরের বাগান দিয়ে চকিত পদক্ষেপে চলে যাচ্ছে জলপাই রঙা মেয়েরা। জানেন তো, এসব অঞ্চলে চাষিদের বলা হয় গার্ডেনার, আর তাঁরা তাঁদের ফার্মকে বলেন অরচার্ড। তাঁরা অলিভের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী। মেয়েদের কালো, লম্বা চুল, অলিভ অয়েল-মসৃণ চিকন ত্বক, গভীর কালো চোখের ধার দিয়ে আলগা কাজল।

আফরার উপহার মেডিটেরানিয়ান প্ল্যাটার। এই আবার একটা নতুন কথা তো? আরে, থালি দেখেছেন কখনও? দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁয় গেলে বা আজকাল যে কোনও ভারতীয় খানাপিনার দোকানেই দেখবেন উচ্ছেভাজা থেকে শুরু করে আপনার পছন্দমতো আমিষ, নিরামিষ পদাবলি ছুঁয়ে টানা পায়েস অব্দি একটা সেরেনাড। পেটপুরে খাওয়ার ও খাওয়ানোর সেই চিন্তাধারাটাকেই ইতিউতি কাটছাঁট করে গড়ে তোলা যায় একটা একটা প্ল্যাটার। একটা থালার উপর বসে আছে তামাম ভূমধ্যসাগরের খাজানা। সঙ্গে রং বেরঙের মনমাতাল পানীয়।

আফরায় কথা হল কর্পোরেট এক্সপাট্রিয়েট শেফ ডেভিড কানানজির সঙ্গে। ভদ্রলোক উড়ে এসেছেন জলপাইয়ের দেশ থেকে। আর ছিলেন একজিকিউটিভ শেফ সুমন্ত চৌধুরী। দু'জন মিলে আমাদের পরিচয় করালেন টোম্যাটো, বেল পেপার, ভুট্টা, অলিভ, হাম্মাস দেওয়া ফাটাফাটি সব খাবারের সঙ্গে। সঙ্গে ছিল গ্রিক স্যালাড। আর দেখলাম মেনু বুক-এ মার্কা মারা রয়েছে ক্যালোরি কাউন্টের। গুণে গেঁথে খেয়েই না অত সুন্দর চেহারা ছিল গডফাদার-এর সেই অ্যাপোলোনিয়ার। গোটা একটা প্ল্যাটার বানিয়ে ফেলা বেশ কঠিন কাজ। বরং চেষ্টা করা যেতে পারে তার কোনও একটা অংশ। মেডিটেরানিয়ান নন ভেজ প্ল্যাটারে ছিল হাম্মাস, অলিভ পেস্টো, মুহাম্মারা, পিট্টা ব্রেড, গ্রিক স্যালাড, শিশ টাওক, ল্যাম্ব মিটবল ইন বারবিকিউ। ল্যাম্ব মিটবল ইন বারবিকিউ সস বেশ খেতে।

এক প্লেট মিটবল ইন বারবিকিউ সস বানাতে লাগবে

মাটন কিমা—৫০০ গ্রাম
মাখন—৩ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি—১/২ কাপ
রসুন কুচি—২ চা চামচ
ক্রিম—১/২ কাপ
পার্সলে পাতা—২ চা চামচ
ব্রেড ক্রাম্ব—১/২ কাপ
ডিম—১টা
টমেটো সস—২ চা চামচ
চিনি—স্বাদমতো
টমেটো কুচি—১ কাপ
নুন—স্বাদ মতো
গোল মরিচের গুঁড়ো—২চা চামচ

এবার

প্রথমে বড় একটা ফ্রাই প্যান-এ মাখন দিন।

মাখন গলে গেলে তার মধ্যে পেঁয়াজ আর রসুন কুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ নরম না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এবার কিমা, ক্রিম, পার্সলে পাতা, ব্রেড ক্রাম্বস, ডিম, নুন, গোল মরিচ দিয়ে দিন। মিশ্রণটি দিয়ে ১৬টি বল গড়ে নিন।

আবার খানিকটা মাখনের মধ্যে দিয়ে হাল্কা বাদামি করে ভেজে নিন বলগুলো এরপর টমেটো সস, চিনি, অল্প পার্সলে কুচি আর রসুন কুচি হাল্কা আঁচে গরম করে তার মধ্যে মিটবলগুলো দিয়ে দিন। এটাই এ হপ্তার মেডিটেরানিয়ান মেড ইজি!

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID

A City of New Opportunities

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech
Dream. Believe. Create.

USE
Universal Success

Chowringhee Court, 4th Floor, 55 & 55/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071
033-40026160

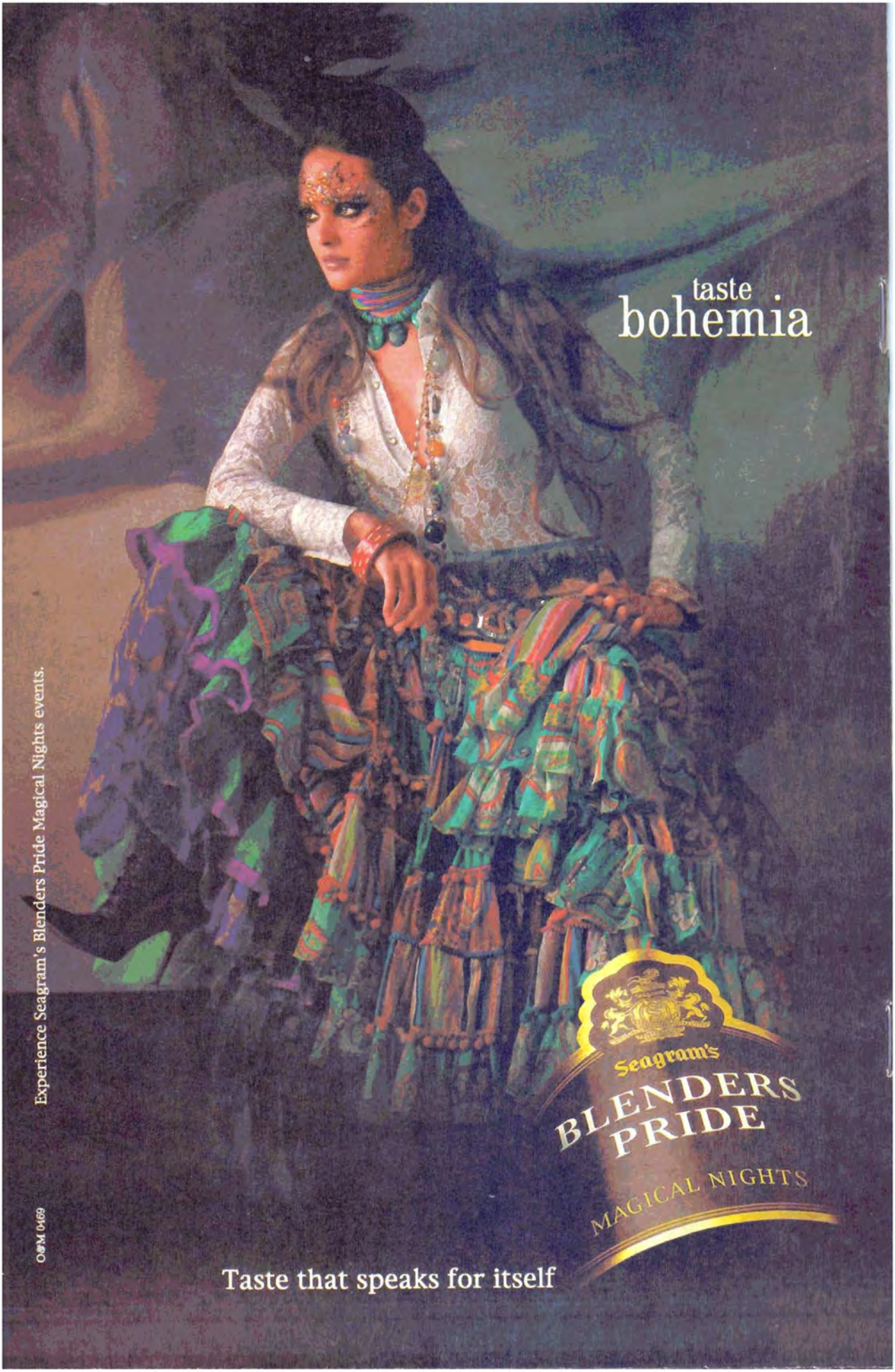
taste
bohemia
Seagram's
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
Taste that speaks for itself
Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
O&M 0469